আলোর পাখিরা

শাহরিয়ার কবির

DORIDRO
.COM
Ontor I Attar I Sondhane

SOBOR ATTAR
ORDEM E
OGRESSO

আলোর পাখিরা

শাহরিয়ার কবির

মাওলা ব্রাদার্স ।। ঢাকা

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

© অর্পণ শাহরিয়ার

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৫
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১৭৫২২৭ ৭১১৯৪৬৩
ই-মেইল : mowla@accesstel.net

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
রফিকুন নবী

কম্পোজ
মুদ্রণ কম্পিউটার্স
সেকশন–১, ব্লক–ই
রোড–৪, বাসা–১৩, মিরপুর

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ রায় চৌধুরী লেন ঢাকা ১১০০

দাম
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 389 4

AALOR PAKHEERA : Juvenile novel by Shahriar Kabir. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers. 39, Bangla Bazar, Dhaka 1100. Cover Design & Illustration by Rafiqun Nabi. Price : Taka Fifty Only.

উৎসর্গ

রামু

রূপা ও চম্পককে

লেখকের অন্যান্য বই

পুবের সূর্য
হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা
নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড়
আবুদের এ্যাডভেঞ্চার
কমরেড মাও সেতুঙ
একাত্তরের যীশু
ওদের জানিয়ে দাও
জনৈক প্রতারকের কাহিনী
সীমান্তে সংঘাত
নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা
আনোয়ার হোজার স্মৃতি ঃ রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে
হানাবাড়ির রহস্য
মিছিলের একজন
পাথারিয়ার খনি রহস্য
মওলানা ভাসানী
মহাবিপদ সংকেত
নিশির ডাক
বার্চবনে ঝড়
ক্রান্তিকালের মানুষ
বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী
কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার
কার্পেথিয়ানের কালো গোলাপ
রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্র
বহুরূপী
অন্যরকম আটদিন
চীনা ভূতের গল্প
বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র
গণআদালতের পটভূমি
অনীকের জন্য ভালোবাসা
লুসাই পাহাড়ের শয়তান
বাভারিয়ার রহস্যময় দূর্গ
একাত্তরের পথের ধারে
সাধু গ্রেগরির দিনগুলি

আলোর পাখিরা

'ছুটির পর যাবি ওখানে?'

'যাবো।'

'ছুরি নিয়েছিস?'

'নিয়েছি।' উঁচু হয়ে থাকা পকেটটা পিন্টুকে দেখালো রতন। পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'তুই নুন আর মরিচের গুঁড়ো নিয়েছিস?'

হেসে স্কুল ব্যাগের ভেতর থেকে কাগজের পুরিয়া বের করে রতনকে দেখালো পিন্টু। স্কুল ছুটির পর ওরা আজ কাঁচা আম পাড়ার অভিযানে বেরোবে। গতকালই বাড়ি ফেরার সময় আলাপ করেছিলো। অভিযানের প্রস্তুতি ঠিকমতো নেয়া হয়েছে দেখে দুই বন্ধু হাসিমুখে ক্লাসের দিকে পা বাড়ালো। কারণ বুড়ো দপ্তরি কৃষ্ণপদ তখন ঢং ঢং করে পেতলের ঘন্টাটা ধীরে ধীরে বাজাচ্ছিলো ।

ওরা দু'জন এবার ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠেছে। লেখাপড়ায় খুব ভালো না হলেও পনের-ষোলর নিচে কখনও নামে না। ওদের প্লেসও থাকে কাছাকাছি , কোনো কোনো বছর একজনের পরেই আরেকজন। কে ওপরে আর কে নিচে থাকলো এ নিয়ে ওরা কখনও মাথা ঘামায় না। ক্লাসের টিচাররা ওদের বলেন, 'মানিক জোড়'। ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকে পুরোনো ঢাকার লক্ষী বাজারের এই মিশনারি স্কুলটায় ওরা পড়ছে। কেউ বলতে পারবে না কোনোদিন ওরা ক্লাসে অনুপস্থিত ছিলো! পড়াশোনার জন্য প্রাইজ না পাক, 'পারফেক্ট এ্যাটেনডেন্স'—এর প্রাইজটা ওদের জন্য বাঁধা। তবে ক্লাসের পড়া ভালো না লাগলেও গল্পের বই হাতের কাছে পেলেই ওরা গোগ্রাসে গিলে ফেলে। বিশেষ করে রোমাঞ্চ আর রহস্যের বই পেলে তো কথাই নেই!

কাগজিটোলার গলির মুখে পিন্টুদের বাসা আর গলির শেষ মাথায় রতনদের বাসা। স্কুলের দিন রোজ সকালে রতন বাসা থেকে বেরিয়ে পিন্টুদের দরজার বাইরে থেকে ওকে ডাকে। পিন্টু তৈরি থাকে। রতনের ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে। বাসায় ওরা চারজন মানুষ। বাবা, মা, বড় বোন হাসি আর ও নিজে। ঠিকে ঝি হাজেরা বুয়া সকাল বিকাল দু' বেলা এসে থালা বাসন মেজে , ঘর ঝাট দিয়ে, কাপড় কেচে চলে যায়। রান্নার কাজ মা নিজে করেন। রতনদের বাড়িতে অনেক মানুষ। ভাই বোন ওরা সাত জন, মা বাবা আছেন, আর আছেন বুড়ি ঠাকুরমা। রতনরা ডাকে 'ঠাম্মা'।

রতনের বাবা শ্যামবাজারে বসাকদের চালের আড়তে ম্যানেজারের কাজ করেন। ওর বড় ভাই যতীন ইসলামপুরে সাহাদের জুয়েলারি শপ-এর

সেলসম্যান। ওদের বাড়ির অবস্থা বেশি ভালো নয়। পিন্টুর বাবা এজি অফিসে চাকরি করেন। বেতন যদিও রতনের বাবার সমানই, তবে গ্রামের বাড়ি থেকে সারা বছরের চাল আসে। যে জন্য রতনদের চেয়ে পিন্টুদের বাড়ির অবস্থা ভালো। অবশ্য ওদের বাড়িতে মানুষের সংখ্যা রতনদের তুলনায় অনেক কম, অবস্থা ভালো হওয়ার সেটাও একটা কারণ।

রতনের বাবা বয়সে পিন্টুর বাবার চেয়ে সাত আট বছরের বড় হবেন। তারপরও প্রায় সন্ধ্যায় দু'জন এক সঙ্গে বসে দাবা খেলেন, নয়তো রহমত ব্যাপারীর গদিতে বসে অন্যদের সঙ্গে আড্ডা দেন। রতনকে যেমন পিন্টুদের বাড়ির কেউ বাইরের ছেলে মনে করে না, পিন্টুকেও রতনদের বাড়িতে সবাই ঘরের ছেলে মনে করে। পিন্টু ভালো আঁকতে পারে বলে রতনের ঠাকুরমা ওকে দিয়ে লক্ষী পূজোর আলপনা আঁকিয়ে নেন। পিন্টুদের বাড়িতে শামী কাবাব খেয়ে রতন বোনদের কাছে গল্প করে। ওদের বাড়ির সবাই জানে শামী কাবাব গরুর মাংস দিয়ে বানায়। ঠাকুরমার কানে গেলে শুধু বলেন, 'খবরদার চান না করে আমাকে ছুবি না।' মাঝে মাঝে রতনের বড় পিসি ওদের বাড়িতে এসে এসব অনিয়মের কথা শুনলে খানিক হইচই করেন। ঠাকুরমা হেসে বলেন, 'আজকাল কি আর এত বাছ বিচার করে চলা যায় বাছা!'

বকরি ঈদের সময় রতনের বাবাও কয়েক বার পিন্টুদের বাড়িতে গরুর গোশত খেয়েছেন, তবে সে কথা বাড়ির কাউকে বলেননি। পিন্টুর বাবাও রতনদের বাড়িতে এসে সোনাহেন মুখ করে কাঁকড়ার ঝোল খেয়ে তারিয়ে তারিয়ে বন্ধুদের কাছে গল্প করেছেন। কচ্ছপও খেতে চেয়েছিলেন, রতনেদের বাড়িতে কেউ খায় না বলে পিন্টুর বাবার খাওয়া হয়নি। পিন্টু নিজেও ওর বাবার মতো সর্বভুক। চীনারা সাপ খায় শুনে ওর এক বড়লোক মামার সঙ্গে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে সাপ খেতে চেয়েছিলো। রেস্টুরেন্টের চীনা ম্যানেজার হেসে বলেছে সাপ খেতে হলে চীনে যেতে হবে। আর চীনে একবার যেতে পারলে শুধু সাপ কেন, ব্যাঙ থেকে শুরু করে অক্টোপাস পর্যন্ত সবই খেতে পাওয়া যাবে। রতন অবশ্য গরুর মাংসে মজা পেলেও সাপ ব্যাঙে ওর রুচি নেই।

সেদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পরই দুই বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে কাঠের পুল পার হয়ে গেণ্ডারিয়া ষ্টেশন ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে চলে গেলো। ভাগ্যকূলের জমিদারদের এক পরিত্যক্ত বাগানবাড়ি ওরা আগে থেকেই খুঁজে বের করেছিলো। মস্ত বড় বাড়িটা অনেক পুরোনো, বেশির ভাগ ঘরেরই দরজা জানালা নেই, মোটা চুন সুরকির আস্তর দেয়া ছোট ছোট ইটের দেয়ালও অনেক জায়গায় ভেঙে পড়েছে। সবাই বলে এ বাড়িতে বাদুড় আর কবুতর ছাড়া মস্ত বড় কালো কালো যে সব সাপ ঘুরে বেড়ায় সেগুলো আসলে নাকি জ্বীন। জমিদারদের অত্যাচারী পূর্ব পুরুষদের অনেকের আত্মা নাকি মুক্তি না পেয়ে এখনও বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের কেউ ভয়ে বাড়ির ত্রিসীমানায়ও যায় না। তারপরও পিন্টু আর রতন আম পাড়ার

জন্য এ বাড়িটাই বেছে নিয়েছে।

বাড়ির পেছনের বাগানে আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল, চালতা, কামরাঙা—সব গাছই আছে। ভূতের ভয়ে মানুষ আসে না, পাকা ফল সব বাদুড়ে খায়। গত বছর থেকে পিন্টু আর রতন বাদুড়দের দলে ভিড়েছে। অবশ্য বাদুড়দের জ্বালায় পাকা ফল খাওয়ার জো নেই। কাঁচা আম বাদুড় খায় না বলেই রক্ষে।

এবার একটা গাছেই আম ধরেছে। তাও অনেক দেরিতে। একেকটা গাছের বয়স তো কম হলো না। খুনখুনে বুড়ো অযত্নের গাছগুলোতে দু' তিন বছরে একবার ফল ধরে। আম গাছের গোড়ার দিকে বোলতার বাসা ছিলো। তাই ঢিল ছুঁড়ে মাত্র পাঁচটা আম পাড়তে পেরেছে ওরা। দাম শ্যাওলায় ঢাকা পুকুরের ভাঙা ঘাটে বসে সেই আম ওরা লবন আর মরিচের গুঁড়ো দিয়ে জিভে টকাস টকাস শব্দ তুলে খেলো।

জায়গাটা অস্বাভাবিক রকম চুপচাপ। এত গাছপালা তবু পাখির সাড়াশব্দ নেই। গ্রামের লোকে বলে অভিশপ্ত হানাবাড়িতে বাদুড় ছাড়া অন্য কোনো পাখি থাকে না। অন্য প্রানীদের ভেতর একমাত্র সাপ থাকে, তাও নাকি সত্যিকারের সাপ নয়। আমের শেষ টুকরোটা চিবোতে চিবোতে পিন্টু বললো, 'এতদিন এখানে এলাম—বাড়ির ভেতরটা কখনও দেখা হলো না।'

পিন্টুর কথা রতনের পছন্দ হলো না। শুকনো মুখে বললো, 'বাড়ির ভেতর সাপ খোপ ছাড়া দেখার কী আছে?'

'এরকম বাড়িতেই গুপ্তধন থাকে।'

'যদি থাকে নিশ্চয় পাহারা দেয়ার জন্য যখেরা আছে।'

'তুই কী করে জানলি যখ আছে?'

'ঠাম্মার কাছে যখের কথা কত শুনেছি! ওদের এক পূর্বপুরুষ দশ ঘড়া মোহর মাটিতে পুতে দশ বছরের একটা ছেলেকে মেরে যখ বানিয়ে সেগুলো পাহারা দেয়ার জন্য বসিয়ে রেখে গেছেন। লোভে পড়ে কয়েকবার ডাকাতরা চেষ্টা করেছিলো সেগুলো উদ্ধার করতে। সব কটা মুখে রক্ত উঠে মরেছে।'

'ঠিক আছে, গুপ্তধনে কাজ নেই। এমনি চল না ঘুরে আসি।'

'যাবি? সন্ধ্যে হতে আর বেশি দেরি নেই।'

'বেশিক্ষণ থাকবো না। সূর্য ডোবার আগেই বেরিয়ে আসবো।' বলে উঠে দাঁড়ালো পিন্টু।

ওকে ফেরানো যাবে না একথা ভালো করেই জানে রতন। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পিন্টুর সঙ্গে ভাগ্যকূলের জমিদারদের ভাঙা বাড়িটার দিকে পা বাড়ালো। মনে মনে ঠাকুরমার মতো করে বললো,' দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, রক্ষা কর মা!'

পিন্টুর ধারণা ছিলো হানাবাড়ির ভেতর গুপ্তধন না পাক অন্তত ভয়ঙ্কর কোনো ডাকাতদেলের গোপন আস্তানা অবিষ্কার করে ফেলবে। রহস্য কাহিনীগুলোতে প্রায়ই দেখা যায় হানাবাড়িগুলো হয় ভূত-প্রেত নয়তো চোর ডাকাতের আখড়া।

এসব বই পড়তে পড়তে অনেক সময় ওর মনে হয়েছে ও নিজে যদি সত্যি সত্যি এমন কোনো ডাকাতের দলের সন্ধান পেতো! খবরের কাগজে ওর ছবি ছাপাতে, গলায় সোনার মেডেল পরিয়ে দেয়া হতো—আরও কত কিছু হতো, কিন্তু বাস্তব জীবন নন্দী স্যারের অংক ক্লাসের মতোই নিরস আর একঘেঁয়ে।

ভাঙা বাড়ির বারান্দাটা এক সময় শ্বেত পাথরে বাঁধানো ছিলো। বেশ কিছু চৌকো পাথরের টুকরো কারা যেন খুবলে তুলে নিয়ে গেছে। খোলা জায়গায় পোড়া ঘায়ের মতো ফ্যাকাশে লাল সুরকি দেখা যাচ্ছে। শ্বেত পাথরের ছিটেফোঁটা টুকরো যাও আছে পুরু ধুলোর চাদরে সব ঢাকা পড়েছে।

বড় বড় ফাটল ধরানো সিড়ি বেয়ে নিচের তলার টানা বারান্দায় উঠেই রতন আঁতকে উঠলো। হাত পাঁচেক লম্বা সাপের খোলস পড়ে আছে সামনে, বোঝা যায় অল্প কিছু দিন আগে ছেড়েছে। ভয় পেয়ে ও সরে এসে পিন্টুর হাত ধরলো। পিন্টু মৃদু হেসে বললো, 'সাপের খোলস দেখেই এত ভয়! সত্যিকারের সাপ দেখলে না জানি কী করবি।'

'থাক।' সামান্য রুক্ষ গলায় রতন বললো, 'অবেলায় ওসব জিনিসের নাম মুখে নেয়া দরকার নেই।'

পিন্টু হাসলো, 'তুই দেখছি সেকেলে বুড়িদের মতো কথা বলছিস!'

রতন মনে মনে বললো, 'যখন ধরে ঘাড় মটকে দেবে তখন টের পাবি মজাটা।'

লম্বা বারান্দার ওপাশে বড় হলঘরে দরজা জানালা কিছুই নেই। ভেতরের দিকে কয়েকটা নড়বড়ে চৌকাঠের সঙ্গে এক আধখানা ক্ষয়ে যাওয়া কাঠের পাল্লা ঝুলছিলো। ধুলো আর মাকড়শার জাল দেখে মনে হয় একশ বছরে কেউ এ বাড়িতে পা রাখেনি। ওদের পায়ের সাড়া পেয়ে ঝটপট করে দুটো বাদুড় উড়ে গেলো। রতন আরেকবার আঁকড়ে ধরলো পিন্টুর হাত। স্কুল টীমে ক্রিকেট ফুটবল দুটোই খেলে পিন্টু। রতনকে অনেক বলেও খেলার মাঠে নামাতে পারেনি ও। শুধু ভূতের ভয় নয়, ক্রিকেট বলকেও ভয় পায় ও। পিন্টুর ফুটবল খেলা দেখার সময় সাইড লাইন থেকে দশ হাত দূরে গিয়ে বসে। অত বড় একটা বল কখন ছিটকে এসে নাকে মুখে লাগে সেই ভয়ে সারাক্ষণ ফুটবলের মাঠে সিঁটিয়ে থাকে রতন।

হলঘরের পর দুটো কড়ি বরগা খসে পড়া ঘর পেরিয়ে বাড়ির পেছনে এসে রতন আর পিন্টু দু'জনই চমকে উঠলো। এক সময় এদিকটায় বাগান ছিলো। গোটা পাঁচেক গন্ধরাজ ফুলের নড়বড়ে বুড়ো গাছ ছাড়া বাকি সব জংলা লতা আর কাঁটা ঝোপে ভরা। ডান পাশে শান বাঁধানো কুয়োতলা দেখা যাচ্ছে। কুয়োর উঁচু পাড়ের খানিকটা ভাঙা হলেও জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। একপাশে দড়ির ওপর রংচটা একটা শাড়ি শুকোতে দেখে ওরা ভীষণ অবাক হলো। শাড়িটা মোটা কাপড়ের, মাঝে মাঝে শেলাই করা, এক জায়গায় তালিমারা, বাতাসে আস্তে আস্তে দুলছে।

পিন্টু চাপা গলায় বললো, 'তার মানে এখানে লোক থাকে!'

রতন বললো, 'যেই থাকুক নিশ্চয় ভালো লোক নয়।'

'গুণ্ডাদের আখড়ায় শাড়ি আসবে কোত্থেকে?'

' হয়তো কাজের ঝি-টি হবে।'

'দেখে তো মনে হয় ফকিরণীর কাপড়।'

পিন্টুর একটা হাত ধরে রতন বললো, 'চল ফিরে যাই। খারাপ লোক কেউ থাকলে মেরে লাশ গুম করে দেবে।'

'এতই সোজা!' হাতের মাসল দেখিয়ে পিন্টু বললো, 'কে কাকে লাশ বানায় দেখে নেবো।'

পিন্টুর এসব গোঁয়ার্তুমি রতনের একটুও ভালো লাগে না। আবার ওকে ছাড়া এক পাও চলতে পারে না। আপন মনে গজ গজ করতে করতে বললো, 'কিছু যদি হয় আমাকে দোষ দিতে পারবি না।'

মুখ টিপে হেসে পিন্টু বললো, 'কিছুই হবে না। চল ওদিকের ঘরগুলোয় গিয়ে দেখি। গুণ্ডা, বদমাশের আস্তানা হলেও বোঝা যাচ্ছে ওরা কেউ এখন নেই।'

বড় বাড়িটা থেকে অল্প দূরে এক লাইনে পাশপাশি গোটা ছয়েক ঘর। ডান পাশের দুটো ঘরের ছাদ ভেঙে পড়লেও বাঁ পাশের দুটো ঘর মোটামুটি অক্ষতই বলা চলে। যদিও দেয়ালের চুন সুড়কির আস্তর খসে পড়ে ছোট ছোট লাল ইটগুলো দাঁত বের করে আছে, তবু দরজা দুটো অক্ষত ছিলো। জায়গাটাও বেশ পরিষ্কার।

ঘরগুলোর দিকে ওরা কয়েক পা এগিয়ে গেলো। রতনের মনে হচ্ছিলো এই বুঝি দরজা খুলে কোমরে লাল গামছা বাঁধা টকটকে লাল চোখওয়ালা ষণ্ডা মতো লোক রামদা হাতে বেরিয়ে আসবে আর কিছু বলার আগেই এক কোপে ওদের ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দেবে, ঠিক যেভাবে সুরিটোলার সিংহীদের বাড়িতে কালীপূজোয় পাঁঠাবলি হয়। রতনের দিকে পিন্টুর তখন কোনো খেয়ালই নেই। আগে আগে হাঁটছিলো ও, যদিও সতর্ক ছিলো ষোলআনা।

দরজা বন্ধ করা ঘরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো ওরা। পিন্টু ভেবেছিলো ঘরে কেউ নেই, দরজা বুঝি বাইরে থেকে বন্ধ। কাছে আসতেই ওর ভুল ভাঙলো। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শেষ বিকেলের নরম আলোয় অসম্ভব নির্জন জায়গাটাকে মনে হচ্ছিলো পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো জগৎ। যে পিন্টু কোনো কিছুই ভয় পায় না ওর বুকের ভেতরটাও একটু শির শির করে উঠলো। রতনের মনে হচ্ছিলো ভাগ্যকুলের জমিদারদের অত্যাচারী পূর্ব পুরুষদের অতৃপ্ত আত্মারা ওর চারপাশে কুপিত হয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ওদের এলাকায় অবাঞ্ছিতদের অনধিকার আগমনের জন্য।

ওদের চোখের সামনে বন্ধ দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেলো। অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো শনের মতো সাদা চুলওয়ালা কুচকুচে কালো এক

চিমসে বুড়ি। চোখ দুটো গর্তে বসা, নাকটা টিয়া পাখির ঠোঁটের মতো, হাতে একটা চকচকে বাঁকানো লাঠি। রতনের মনে হলো অন্ধকারের জগত থেকে আসা এক ডাইনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এক্ষুনি বুঝি বিকট শব্দে চিৎকার করে উঠবে ডাইনিটা। সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোটা হিংস্র কালো বেড়াল ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের টুটি ছিড়ে ফেলবে আর ফিনকি দিয়ে ছিটকে আসা রক্ত শুষে খাবে ভয়ঙ্কর এই ডাইনি। ভয়ে রতনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। দু' হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো পিন্টুর হাত।

দরজা খুলে দুটো অচেনা ছেলে দেখে বুড়ি নিজেও ভীষণ ভয় পেয়েছে। লোকজনের চোখের আড়ালে থাকার জন্য অনেক খুঁজে এই পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িটা বের করেছে। এখন বুঝি এটাও হাতছাড়া হয়! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ি বললো, 'তুমরা কুথা থিকা আসছো বাবুজীরা? হামলোগ তো কুছু করি নাই।'

বুড়ির কথায় হিন্দুস্তানি টান। পিন্টু জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কারা, এখানে কি করছো?'

'হামার নাম হরিমতিয়া। ইখানে হামি আর হামার মা থাকি। মার বহুৎ বিমার হইয়েছে। গিলাস ফিকটরির বগলে হামাদের ঘর ভাঙ্গিয়া দিল গারমিন। মা'র বিমার দেখে সবলোগ ভাগাইয়া দিল। থাকনের কুন জায়গা না পাইয়ে ইখানে আসছি। বাবুসাব, হামরা কার ক্ষেতি করি নাই।'

'ভয় পেয়ো না।' বুড়িকে আশ্বস্ত করে পিন্টু বললো, 'আমরা তোমাদের কথা কাউকে বলবো না। তোমরা কি বিহারী?'

'না বাবু, হামাদের গাঁও মাদ্রাজে। হামার দাদা ইখানে আসছিলো কামের তালাশে। হামার বাপ দাদারা ধাঙ্গড়ের কাম করতো। মা'র যখন বিমার ছিল না হামিও মিনসিপালিটিতে জমাদারনির কাম করতাম। অখুন পুরা কাম করতে পারি না। টিশনে ঠিকা কাম করি। বুড়া বিমার মাকে নিয়ে কুথায় যাই বাবু! বহুৎ মুসিবতে আছি।'

'মার অসুখ হয়েছে হাসপাতালে যাও না কেন? ভাল ডাক্তার দেখাও।'

'ধাঙ্গড়দের হাসপাতালে থাকতে দেয় না বাবুজী। ডাক্তার দিখানোর রুপিয়া কই পামু? দো ওয়াক্ত সুখা রোটি ভি দিতে পারি না বিমারি মাকে।' বলতে বলতে বুড়ি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

'তুমি কেঁদো না হরিমাতিয়া।' সান্ত্বনার গলায় পিন্টু বললো, 'আমাদের পরিচিত এক ডাক্তার আছে। তোমার মাকে আমরা ডাক্তার দেখাবো।'

কাঁদতে কাঁদতে হরিমাতিয়া বললো, 'ভগবান তুমাদের ভালা করবেন বাবুজী। পরসু মাহিনা মিলবে। দো রোজ মাকে খানা দিতে পারি নাই।'

পিন্টু রতনের কানে কানে বললো, 'তোর কাছে টাকা আছে?'

বুড়িকে কাঁদতে দেখে রতনের ভয় কেটে গিয়ে ওর জন্য গভীর মমতায় বুকটা ভরে গেছে। বললো, 'তিন টাকা আছে, বলপেন কেনার জন্য রেখেছিলাম।'

'আমার কাছে দশ টাকা আছে। তোকে আমার একটা কলম দেবো। চল, আগে এদের কিছু খাবার কিনে দিই।' এই বলে হরিমতিয়ার দিকে তাকালো পিন্টু— 'আমরা তোমাদের জন্য আটা আনছি। ভয় পেয়ো না।'

গেন্ডারিয়া স্টেশনের আগেই একটা মুদির দোকান আছে। হেঁটে গেলে মিনিট পনেরো লাগতো। পিন্টু আর রতন দৌড়ে আসাতে সাত মিনিট লাগলো। দু'জনের টাকা দিয়ে ওরা এক কেজি আটা, দু'টাকার মুড়ি আর এক টাকার পেঁয়াজও কিনলো। স্কুলের বিহারী দারোয়ান কুদরত খানকে ওরা দেখেছে পেঁয়াজ দিয়ে রুটি খেতে।

সূর্য ডোবার আগেই ওরা ফিরে এলো হানাবাড়িতে। আটা পেয়ে অভুক্ত হরিমাতিয়া--'ভগবান তুমাদের....' বলে আরেক দফা কাঁদলো। ওরা দেখলো দরজার একপাশে হরিমতিয়ার মা বসে আছে কুঁজো হয়ে। সারা মুখে আর গায়ের চামড়া কুঁচকে গেছে। হরিমতিয়ার কথা শুনে ওর মা মাথা তুলে চোখ পিট পিট করে কফ জমানো ঘড়ঘড়ে গলায় কী বললো কিছুই বোঝা গেলো না। চোখের পানি মুছে হরিমতিয়া বললো, 'মা বুলছে তুমরা দেওতা আছ। ভগমান তুমাদের পাঠাইছে।'

পিন্টু হেসে বললো, 'আমরা দেবতা নই, মানুষ। মানুষের বিপদে মানুষকে পাশে দাঁড়াতে হয়।'

কথাটা ওদের বাংলার নলিনী স্যার সব সময় বলেন। প্রাণীদের ভেতর একমাত্র মানুষই একজনের বিপদে আরেকজন পাশে এসে দাঁড়ায়। পশুদের সঙ্গে মানুষের তফাৎ হচ্ছে--পশুরা নিজের জন্য বাঁচে, মানুষ শুধু নিজের জন্য বাঁচে না, সমাজের কথাও ভাবে।

রতন বললো, 'হারিমতিয়া আজ আমরা যাই। কাল না হয় পরশু ডাক্তার নিয়ে আসবো।'

হরিমতিয়া শুকনো গলায় বললো, 'জানাজনি হলে হামাদের মুসিবত হোবে বাবুজি। ফির হামার বিমারি মাকে নিয়ে বেঘর হোতে হোবে।'

'না না, কেউ জানবে না।'

কফ জড়ানো গলায় হরিমতিয়ার মা আবার কিছু বললো। হরিমতিয়া একটু বিব্রত হলো। একটু ভয়ে ভয়ে বললো, 'মা বুলছে বাবুজি তুমলোগ হিন্দু আছ না মুসলমান আছ?'

পিন্টু আর রতন একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। পিন্টুর কাঁধে হাত রেখে রতন বললো, 'হরিমাতিয়া আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই। আমরা তোমার মতোই মানুষ।'

ঃ দো ওয়াক্ত দুটা সুখা রোটি
দিতে পারি না মাকে,
দুধ কুথায় পামু বাবুজী

দুই

ডালপট্টির মোড়ে নিউ এজ ফার্মেসিতে সন্ধ্যার পর বসে পিন্টুদের পাড়ার তরুণ ডাক্তার ইরফান। এক সময় ছাত্র ইউনিয়ন করতো, পরে কিছুদিন কমিউনিস্ট পার্টিও করেছিলো। রাশিয়ায় গর্ভাচেভের কাণ্ড কারখানা দেখে পার্টি করা ছেড়ে দিয়েছে। হালে জামাতীদের বিরুদ্ধে যে নির্মূল কমিটি হয়েছে সেখানে ঢুকেছে। গরিব রোগীদের কাছ থেকে ভিজিট নেয় না বলে ফার্মেসিতে সন্ধ্যার পর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না।

বাড়ি ফেরার পথে পিন্টু আর রতন ওখানে ঢুঁ মারলো। ফার্মেসির কর্মচারীকে পিন্টু জিজ্ঞেস করলো, 'ইরফান ভাই আজ কতক্ষণ থাকবেন?'

পিন্টুদের ভালো করেই চেনে ছোকরা কর্মচারীটা। হেসে বললো, 'আইজ মনে ওইতাছে স্যারে দশটার আগে বাড়িত যাইবার পারবো না।'

'ঠিক আছে। ইরফান ভাইকে বোলো আমরা এসেছিলাম। কাল বিকেলে বাসায় যাবো।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ওদের সাতটা বাজলো। রতনদের বাড়িতে অনেক মানুষ। ছেলে মেয়েদের ভেতর কে কখন আসছে যাচ্ছে সেসব খবর রাখার মতো সময় রতনের মার নেই। পিন্টুদের বাড়ির কথা আলাদা। সন্ধ্যেবেলা ওর বাবা বাড়ি ফিরেই খবর নিয়েছেন পিন্টু কোথায়। মা নিজেও জানেন না পিন্টু কোথায়। বানিয়ে বললেন, 'নিশ্চয় কোথাও ফুটবল নয় ক্রিকেট নিয়ে মেতে আছে। ভেবো না, এসে যাবে।'

'ওকে বলে দেবে সন্ধ্যার পর বাইরে থাকা আমি পছন্দ করি না।' এই বলে বাবা কাপড় পাল্টাতে ঘরে ঢুকলেন। এরপর তিনি কলতলায় যাবেন। ঘরে এসে চা খাবেন মুড়ি ভাজা দিয়ে। রতনের বাবা এলে তাঁর সঙ্গে দাবা খেলবেন। নয়তো রহমত ব্যাপারীর গদিতে যাবেন আড্ডা দিতে। রাতের খাবার খাবেন নটায়। তার আগে পিন্টুর খোঁজ পড়বে না। মা ভাবলেন এর আগে নিশ্চয় ছোঁড়াটা এসে যাবে।

পিন্টুর বাবাদের গ্রামের বাড়ি যশোরে। ওর নানার বাড়ি বর্ধমান। সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর নানারা খুলনার সাতক্ষিরায় বাড়ি করেছেন। এক মামা আছেন, সাতক্ষিরায় ওকালতি করেন, কখনও কোনো দরকারে ঢাকা এলে পিন্টুদের বাড়িতে ওঠেন। বাবার এক ভাই আর দুই বোন গ্রামে থাকেন। পিন্টুর ফুপুদের বিয়েও হয়েছে গ্রামে। অনেক আগে পিন্টুর বয়সী ওর বড় ফুপুর ছেলে ফুপার সঙ্গে ঢাকা এসে ওদের বাড়িতে উঠেছিলো। বাবা মাঝে মধ্যে চিঠি লিখে খোঁজ খবর নেন। চাচা সারা বছরের চাল আর তিরিশ চল্লিশটা নারকেল পাঠিয়ে কর্তব্য সারেন। বাবার হিসেব মতো চাচার আরও পাঠানো উচিৎ তবে এ নিয়ে চাচাকে কখনও কিছু বলেননি।

রতনদের অবস্থা অন্যরকম। ওদের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর। বাড়িতে এখন

ওরা পাঁচ ভাই বোন থাকে। ওরা বড়দি আর মেজদির বিয়ে হয়ে গেছে অনেক আগে। তার পর দু'ভাই যতীন আর স্বপন। বড়দা চাকরি করে, মেজদা এম,এস,সি পাশ করে দু'বছর ধরে চাকরির জন্য ঘুরছে। তারপর সেজদি, বাংলায় অনার্স পড়ে ইডেন কলেজে। ছোড়দি পড়ে সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজে। রতন সবার ছোট।

ওদের কাকা, মামা, মাসি, পিসির সংখ্যাও কম নয়। ব্যবসার কাজে কিংবা মামলা মোকদ্দমার কাজে ঢাকায় এসে অনেকে হোটেলে উঠলেও দু' বেলা না খেয়ে যায় না। জামাই ষষ্ঠীতে বড়দি মেজদি যখন গোটা পরিবার নিয়ে বেড়াতে— আসে তখন বাড়িতে পা ফেলার জায়গা থাকে না। বাড়িতে লোকজন বেশি এল-এ রতন রাতে পিন্টুর সঙ্গে ঘুমায়। স্বপন হলে বন্ধুদের কাছে থেকে যায়।

সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে রতন হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসবে, সেজদি তপতী এসে বললো, 'কই আছিলি এতক্ষণ। মা আবার ফিট ওইয়া গেছে। ওষুধ আইনা দে।'

রতনের মার অনেক দিনের পুরোনো ফিটের ব্যামো। কাজের চাপ বেশি থাকলে তিনি প্রায়ই জ্ঞান হারান। বিছানায় শুয়ে থাকেন একবেলা। পাড়ার পুরেনো ডাক্তার কৈলাশ হোমিও'র ওষুধ খান দুই ডোজ। তারপর সুস্থ হন।

এমনিতে রতনের স্কুলের পড়া মনে থাকে না, তার ওপর পড়ার সময় এটা সেটা করতে বললে ওর ভারি রাগ হয়। আলনায় রাখা জামাটা গায়ে দিতে দিতে বললো, 'মা ফিট হইছে আর তোমরা বইয়া রইছ আমার লাইগা। ক্যান, মেজদারে কইতে পার নাই?'

সেজদি ওর হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে বললো, 'ম্যালা প্যাচাল পাড়িস না। মেজদা ঘরে থাকলে তো কমু।'

রতন গজ গজ করতে করতে ওষুধ আনতে গেলো। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার আর মাত্র এক মাস বাকি। বাবা এমনিতে লেখাপড়ার কোনো খোঁজ নেন না। তবে পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ড তাঁর পছন্দ না হলে এখনও চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকান। রতন ভালো করেই জানে পরীক্ষার ফল ভালো করে বাবাকে খুশি করা কী কঠিন কাজ। যেবার তপতী ক্লাস এইটে বৃত্তি পেলো সেবারই বাবার মুখে প্রথম হাসি ফুটেছিলো। এইচ.এস.সি.—তে তিনটা লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে তপতী, তারপরও বাবা বলেছেন, 'আর একটু মন দিয়া পড়লে স্টার মার্ক পাইতি। তাইলে আর আমার খরচের চিন্তা করতে ওইতো না।'

রতন অবশ্য মনে মনে ঠিক করে রেখেছে এস.এস.সি.—তে পরীক্ষার ফল যদি ভালো না হয় উঠতে বসতে বাবার গালমন্দ খাওয়া ওর পোষাবে না, সোজা কলকাতায় চলে যাবে। ওর বাবার এক খুড়তুতো ভাই চৌষট্টি সালের দাঙ্গার পর কলকাতা চলে গেছেন। সেখানেই বিয়ে থা করে থিতু হয়েছেন। ওয়েল্ডিং কারখানা বসিয়ে বড় বড় মেশিনের স্পেয়ার পার্টস বানিয়ে ম্যালা টাকা পয়সা করেছেন। বাড়িতে নিজেকে খুবই অবহেলিত মনে হয় রতনের। সবার ছোট বলে রাজ্যের

কাজ ওর কাঁধেই চাপানো হয়। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত মা অবশ্য ওকে বাজারে যেতে দিতেন না। মেজদা স্বপন বাজার করতো। ও সিক্সে ওঠার পর স্বপন একবার ওদের ডিপার্টমেন্ট থেকে সাত দিনের জন্য চট্টগ্রামে যাবে, মা বললো, 'তুই না থাকলে হাট-বাজার করামু কারে দিয়া?' স্বপন রেগে গিয়ে বলেছে, 'ক্যান, রতইন্যারে দিয়া করাইবা! এত বড় দামড়া পোলারে আর কতদিন আঁচলের তলে রাখবা? দশ মিনিট লাগে না সূত্রাপুরের বাজারের যাইতে!'

সকালের বাজার করতে রতনের খারাপ লাগে না। হিসেব করে দু' এক টাকা ওখান থেকে বাঁচানো যায় হাত খরচের জন্য। এমনিতে মা কখনও হাত খরচের পয়সা দেন না। সকালে ডাল আর একটা ভাজি দিয়ে গরম ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। অবশ্য টিফিনে পিন্টু পেয়ারা নয়তো ঘুগনি কিনলে ওকে দিতে কখনও ভোলে না।

গলির মোড়ে পিন্টুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো রতনের। হন হন করে ডালপট্টির দিকে যাচ্ছিলো পিন্টু। অবাক হয়ে জানতে চাইলো রতন—'এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?'

'ওষুধের দোকানে। আপুর জন্য ডেসপ্রিন কিনতে হবে। তুই গিয়েছিলি কোথায়?'

'কৈলাশ ডাক্তারের কাছে। মা আবার ফিট হয়েছে।'

'রাতে আসবি?'

'আজ আসবো না। মেজদা বোধহয় হল-এ থাকবে।' মেজো ভাই না থাকলে রতনের ভারি সুবিধা। গোটা তক্তপোষে ও একা শুতে পারে। হঠাৎ মনে পড়াতে পিন্টুকে বললো, 'ইরফান ভাই'র সঙ্গে দেখা হলে হরিমতিয়াদের কথা বলিস।'

'বলবো।' মৃদু হেসে পিন্টু বন্ধুর কাছে থেকে বিদায় নিলো। ওর মতো রতনের মনটাও খুব নরম।

রাত তখন প্রায় আটটা। নিউ এজ ফার্মেসিতে ইরফান ডাক্তারের রোগী তখনও ছ'সাতজন বসে। পিন্টু একপাতা ডেসপ্রিন কিনে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েছে। বুড়ো ম্যানেজার ভাংতি টাকা গুনছেন, এমন সময় ভেতর থেকে ম্যানেজারকে কিছু বলার জন্য বাইরে এলো ইরফান। পিন্টুর হাতে ডেসপ্রিন দেখে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলো, 'এত ডেসপ্রিন কার জন্য?'

'আপুর মাথা ধরেছে।'

'হাসিকে বলবে এত ডেসপ্রিন খাওয়া ঠিক নয়। মাথা কেন ধরে সে রোগটা আগে সারানো দরকার।'

'হাসিকে এবার এম এ পরীক্ষা দেবে। ওর সঙ্গে গল্প করার জন্য সন্ধ্যায় ইরফান প্রায়ই ওদের বাড়ি যায়। পিন্টু মুখ টিপে হেসে বললো, 'পরীক্ষার দিন যত ঘনিয়ে আসবে আপুর মাথা ব্যথা তত বাড়বে।'

ওকে বোলো কাল বিকেলে যাবো।' এই বলে ইরফান চেম্বারে ঢুকতে যাবে—

পিন্টু বললো, 'আপনার সঙ্গে জরুরী একটা কথা ছিলো ইরফান ভাই।'

'কী কথা?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো ইরফান।

'আমার পরিচিত এক গরিব মহিলাকে দেখতে যেতে হবে। খুব অসুখ, এখানে আসতে পারবে না।'

'কখন যেতে হবে?'

'কাল স্কুল থেকে ফিরে আপনাকে নিয়ে যাবো।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'গেণ্ডারিয়া স্টেশনের কাছে।'

'ঠিক আছে এসো। আমি বাসায় থাকবো।'

হরিমতিয়ার মা সুরিয়াবালাকে দেখে ইরফানের মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। সারা গায়ে বাজে রকমের ঘা হয়েছে। ব্যাগ থেকে ঘায়ে লাগাবার মলম বের করে হরিমতিয়াকে ওটা লাগাবার নিয়ম বুঝিয়ে দিয়ে শেষে বললো, 'তোমার মা'র অসুখ তো ম্যালনিউট্রেশন, পুষ্টির অভাব। মাকে ভাল মতো খাওয়া দিতে হবে। পারলে কিছুদিন দুধ খাওয়াও।'

হরিমতিয়া চোখের পানি ফেলে বললো, 'দো ওয়াক্ত দুটা সুখা রোটি দিতে পারি না মাকে, দুধ কুথায় পামু বাবুজী।'

ইরফান গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালো। ওর বেশির ভাগ গরিব রোগীই এরকম অসুখে ভোগে আর এরকম কথা বলে। এসবে অভ্যস্থ হলেও প্রতিবারই ওর মন খারাপ হয়ে যায়--যখন আবার নতুন করে শুনতে হয়।

বাড়ি ফেরার পথে ইরফান পিন্টুকে জিজ্ঞেস করলো, 'এদের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হলো কিভাবে?'

গতকালের ঘটনাটা ইরফানকে জানালো পিন্টু। রতন জানতে চাইলো, 'হরিমতিয়ার মা বাঁচবে তো ইরফান ভাই?'

'এ যাত্রা বাঁচলেও বেশিদিন বাঁচার আশা নেই। বয়স হয়েছে, শরীরেও কিছু নেই।'

পিন্টু বললো, 'হরিমতিয়ার মা'র পথ্যের জন্য আমরা তো কিছু চাঁদা তুলতে পারি রতন!'

'কোত্থেকে তুলবি?'

'কেন, আমাদের ক্লাসে থেকে? অনেক বড়লোকের ছেলে আছে। পাঁচ দশ টাকা চাঁদা ওরা অনায়াসে দিতে পারবে।'

'টাকা অনেকের আছে। দেবে কিনা সেটাই হলো আসল কথা।'

'বলবো, দিলে সোয়াব হবে।'

'পিন্টু খুব ভালো বুদ্ধি বের করেছো। আমি তোমাদের ফাণ্ডে দশ টাকা চাঁদা দিচ্ছি।' এই বলে ইরফান পকেট থেকে দশ টাকা বের করে পিন্টুর হাতে দিলো।

নিজের প্রশংসা শুনে লাজুক হেসে পিন্টু বললো, 'থ্যাঙ্ক ইউ ইরফান ভাই।'

ক্লাসের ছেলেরা অবশ্য পিন্টুর এ ধরনের আইডিয়ার বেশি প্রশংসা করতে পারলো না। ফার্স্ট বয় রেজাউল, যে রোজ গাড়িতে করে স্কুলে আসে, স্কুলের চারজন টিচার তাকে বাড়িতে গিয়ে আলাদা আলাদা বিষয় পড়ান—পিন্টুর কথা শুনে ঠোঁট উল্টে বললো, 'খেয়ে দেয়ে আর কাজ পেলি না। কোথাকার কোন মেথরনীর জন্য ফাগু তুলতে হবে। ফুঃ!'

রেজার কথা শুনে পিন্টুর খুব রাগ হলো। রতন করুণ গলায় বললো, 'ওদের অবস্থা যদি নিজের চোখে দেখতি তাহলে এভাবে বলতে পারতি না। দুটো গরিব অসহায় বুড়ো মানুষ মানুষের ভয়ে লুকিয়ে আছে সাপ খোপে ভরা এক ভূতের বাড়িতে, দুদিন খেতেও পায়নি বেচারারা!'

'ফকিরনী, মেথরনীদের জন্য আমার অত দরদ নেই। কাজ করে খেতে বলগে।' এই বলে রেজা উঠে চলে গেলো।

ওরা টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে বসে আলোচনা করছিলো। পিন্টু ক্লাসের ক্যাপ্টেন বলে ওর কথায় অনেকেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলো। ছিলো না শুধু তারাই, যারা টিফিন পিরিয়ডে বাড়িতে খেতে যায়। রেজাকে উঠে যেতে দেখে ওর সঙ্গে আরও পাঁচ জন উঠে পড়লো। যাবার সময় বখতিয়ার মুচকি হেসে বললো, 'তার চেয়ে সবাই চাঁদা তুলে রুচিতায় গিয়ে মোগলাই পরোটা আর কিমা খেলে দারুণ হয়!' বখতিয়ারের বাবা হালে ইন্ডেন্টিং ব্যবসা করে অনেক টাকা কামিয়েছেন।

রেজারা চলে যাওয়ার পর ক্লাসের সেকেন্ড বয় ইউসুফ বললো, 'শোন পিন্টু, তুই বলছিস বলে কাল আমি তোকে পাঁচ টাকা দেবো। তবে এভাবে তুই কজনকে ভিক্ষা দিয়ে বাঁচাতে পারবি? দেশে ওদের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রায়ই না খেয়ে থাকে।'

পিন্টু মুখ কালো করে বললো, 'যারা দেশ চালায় ওসব কথা তাদের গিয়ে বল। চোখের সামনে দুটো বুড়ো মানুষ না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে--তাই তোদের বলছিলাম।'

ইউসুফের দেখাদেখি বৈঠকে অন্য যারা ছিলো তারা সবাই চাঁদা দেয়ার ব্যাপারে রাজী হলো। যাদের সঙ্গে টাকা ছিলো তারা তখনই দিয়ে দিলো। অন্যরা বললো, কাল পরশু দেবে। রতন হিসেব করে দেখলো সবার টাকা পাওয়া গেলে সব মিলিয়ে চুরানব্বই টাকা হবে। রতনের হিসেব শুনে পিন্টু বললো, 'আমি আর রতন আগেই ওদের টাকা দিয়েছি। দরকার হলে আরও ছ' টাকা দিয়ে আমি একশ টাকা পুরো করে দেবো।'

দু' দিন পর যার চাঁদা দেবে বলেছিলো, সব আদায় করার শেষে দেখা গেলো রতনের হিসেবে একটু গরমিল হয়েছে। সব মিলে চুরানব্বই নয়, নব্বই টাকা পাওয়া গেছে। রতন পিন্টুকে বললো, 'ইরফান ভাই যে দশ টাকা দিয়েছেন সেটা তো হিসেবে ধরিনি। ওটা ধরলে তো এমনিতেই একশ টাকা হয়ে যায়।'

তিন দিন পর ইন্টার স্কুল ফুটবলের এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে। গেম টিচার রোজ বিকেলে ওদের প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। পিন্টু বললো, 'মঙ্গলবারের ম্যাচটা হয়ে যাক। বুধবার গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসবো।'

রতন নিজে না খেললেও পিন্টুর খেলার সময় ওর ওপর নজর রাখে। কখন বল লেগে জখম হয় কে বলতে পারে! পিন্টুর দিকে জোরে বল আসতে দেখলে রতনের বুক ঢিব ঢিব করে। হরিমতিয়াদের জন্য যদিও ওর উৎকণ্ঠা ছিলো, আটা যতটুকু দিয়ে এসেছে দু' দিনের বেশি চলার কথা নয়--তারপরও পিন্টুকে ফুটবলের মাঠে রেখে ওর একা যেতে ইচ্ছে হলো না। পিন্টু অবশ্য পরদিন ওর বিমর্ষ চেহারা দেখে বলেছে, 'এত ভাবছিস কেন? হরিমতিয়া বললো না দু'দিন পর বেতন পাবে।' এতে রতনের বুকের বোঝা কিছুটা হালকা হয়েছে।

মঙ্গলবার ম্যাচ জিতে দারুণ ফূর্তিতে ছিলো পিন্টু আর রতন। খেলার শেষে গেম টিচার সবাইকে কোক আর মোগলাই পরোটা খাইয়েছেন। সাইড লাইনে বসে যারা খেলা দেখছিলো তারাও বাদ পড়েনি। সবই জানে গেম টিচার বি চৌধুরী স্যার সখের জন্য চাকুরি করেন। তাঁর বাবা যে সম্পত্তি রেখে গেছেন--হেসে খেলে জীবন কাটাতে পারবেন। তার ওপর তিনি বিয়েও করেননি। স্কুলের ছেলেদের নিজের ছেলের মতো ভালোবাসেন তিনি।

পরের দিন বিকেলে পিন্টু আর রতনের সব আনন্দ কর্পূরের মতো উবে গেলো। ভাগ্যকূলের জমিদারদের পোড়ো বাড়িতে এসে দেখে অচেনা লোকজন সেখানে লম্বা লম্বা শেকল আর ফিতা দিয়ে সব মাপজোক করছে। বাইরে ভাঙা পাচিলের পাশে মাথায় হাত দিয়ে হরিমতিয়া বসে আছে। তার পাশে এক টুকরো পুরোনো ছেঁড়া চাটাইয়ে শুয়ে আছে ওর মা।

রতন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে হরিমতিয়া?'

ওদের দু' জনকে দেখে বুড়ি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। বললো, 'হামাদের ফির নিকাল দিছে! হামলোগ কুছু করি নাই বাবুজী।'

কেরানী গোছের একজন বয়স্ক লোক কয়েকটা খাতা বগলে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে পোড়া বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। পিন্টু ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে রুক্ষ গলায় জানতে চাইলো—'এখানে কী হচ্ছে?'

নাকের ডগায় ঝুলে পড়া চশমা টেনে তুলে থুতনি উঁচিয়ে ভদ্রলোক পিন্টুর দিকে তাকালেন। প্রথমে ভেবেছিলেন একটা ধমক দেবেন। পিন্টুর মাসল পাকানো শরীর আর রাগী চেহারা দেখে দমে গিয়ে বললেন, 'এখানে আমজাদ খান সাহেবদের নতুন কারখানা বানানো হবে।'

'এটা তো ভাগ্যকূলের জমিদারদের বাড়ি? আমজাদ খান এলেন কোত্থেকে?'

'জমিদার বাড়ি ছিলো পার্টিশনের আগে। এটা এখন শত্রু সম্পত্তি। আমজাদ খান সরকারী দলের বড় নেতা। সরকারের কাছ থেকে এটা তিনি লিজ নিয়েছেন।' বলে আর দাঁড়ালেন না তিনি। পিন্টুকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে চলে গেলেন।

হরিমতিয়ার কাছে এসে পিন্টু বললো, 'তোমরা এখন কোথায় যাবে?'

চোখের পানি মুছে হরিমতিয়া বললো, 'এ মুলুকে আর থাকবো না বাবুজী। হামলোগ আপনা মুলুক চলে যাবো।'

'সেখানে কেউ আছে তোমাদের?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হরিমতিয়া বললো, 'গাঁওমে আপনা ঘর তো আছে, আমার দাদা যিখানে পয়দা হয়েছিলো । আপনা পড়োসান আছে। বাবুজী, হামলোগ সিখানে চলে যাবো ।'

'সে তো অনেক দূর! যাবে কিভাবে?'

হামারা এক গাঁও ওয়ালি ভাই সাথে যাবে। বাসে করে হামলোগ বিনাপোল যাবো। সিখান থেকে টিরিনে কলকাত্তা হয়ে মাদ্রাজ যাবো।'

'বর্ডার পার হবি কিভাবে? তোমাদের কি পাসপোর্ট ভিসা আছে?'

'বাবুজী, হামলোগ গরিব আদমি, পাসপুট কুথায় পাবো? পুলিসওয়ালাদের পা পাকাড়কে বলবো হামাদের মেহেরবানি করে ছেড়ে দিতে।'

হারিমতিয়াদের জন্য পিন্টু আর রতনের মনে খুব কষ্ট হলো। কোন কালে বাপ দাদার হাত ধরে ছোট্ট হরিমতিয়া এদেশে এসেছিলো ভালো মতো থাকা খাওয়ার আশায়। বেচারি সারা জীবন মানুষের ময়লা সাফ করেছে। অথচ বুড়ো বয়সে মানুষ ওদের নোংরা ময়লার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

পিন্টু পকেট থেকে একশ টাকার নোটটা বের করে হরিমতিয়ার হাতে গুঁজে দিলো। ধরা গলায় বললো, 'এটা রাখো হরিমতিয়া, পথে লাগবে।'

টাকা পেয়ে হরিমতিয়া আরেক দফা কাঁদলো। বললো, 'তুমরা দেওতা আছো বাবুজি। ভগমান তুমাদের ভালা করবেন।'

হরিমতিয়ার কান্না দেখে রতনেরও কান্না পেলো। অতি কষ্টে কান্না চেপে বললো, 'তোমরা কবে যাবে হরিমতিয়া?'

'কাল ভোরে চলে যাবো বাবুজী। তুমাদের কথা কুনদিন ভুলবোনা বাবুজী।'

হরিমতিয়া ওর ষাট বছরের জীবনে মানুষের কাছ থেকে কখনও এতখানি সহানুভূতি পায়নি। ওর ঈশ্বরের কাছে বার বার ছেলে দুটোর মঙ্গল কামনা করলো।

তিন

হরিমতিয়াদের জন্য টাকা তোলার ঘটনাটা স্কুলের টিচাররা জেনে গিয়েছিলেন। ক্লাসে অবশ্য পিন্টুদের কেউ কিছু বলেননি। দিন সাতেক পর বুড়ো ভিনসেন্ট রোজারিও স্যার সন্ধ্যার পর গুটি গুটি পায়ে হেঁটে পিন্টুদের বাসায় এলেন। পিন্টু আর রতনের বাবা তখন বসার ঘরে দাবা খেলছিলেন। রতনের বাবা চিনতে না পারলেও পিন্টুর বাবা ভিনসেন্ট স্যারকে ঠিকই চিনতে পারলেন। স্কুলে 'প্যারেন্টস ডে'তে যখন অভিভাবকদের ডাকা হয় পিন্টুর বাবা কোনোবারই যেতে

ভোলেন না।

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে পিন্টুর বাবা উঠে দরজা খুললেন। সামনে দাঁড়ানো হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট পরা বুড়ো মানুষটিকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'আরে, ভিনসেন্ট স্যার যে! আসুন, ভেতরে আসুন।'

ভিনসেন্ট স্যারের সঙ্গে রতনের বাবার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'স্যার, চা খাবেন তো?'

মৃদু হেসে ভিনসেন্ট স্যার বললেন, 'অসুবিধে না হলে আমার আপত্তি নেই।'

'অসুবিধে কেন হবে! আমরা এখনও চা খাইনি। সবে মাত্র বোর্ড খুলে বসেছিলাম।' এই বলে পিন্টুর বাবা গলা তুলে ছেলেকে ডাকলেন, 'পিন্টু, দেখে যা কে এসেছে!'

আর দু' সপ্তাহ পরে হাফইয়ার্লি পরীক্ষা। পরীক্ষার পর ঠিক হয়েছে ভোলায় রতনের বড়দির বাড়িতে বেড়াতে যাবে। গত শীতে বেড়াতে এসে বড়দি বার বার পিন্টুর মাকে বলে গেছে রতনের সঙ্গে পিন্টুও যেন বেড়াতে যায়। বাবা অবশ্য যথারীতি বলে দিয়েছেন পরীক্ষার ফল ভালো না হলে কোথাও যাওয়া চলবে না। সে জন্য সন্ধ্যে না হতেই পড়তে বসেছিলো পিন্টু।

হঠাৎ বাবার খুশিভরা গলায় ডাক শুনে অবাক হয়ে ও উঠে গেলো বসার ঘরে। ভিনসেন্ট স্যারকে বেতের সোফায় বসে থাকতে দেখে আরও অবাক হলো—এর আগে স্কুলের কোনো টিচার কখনও ওদের বাড়িতে আসেননি। হাত তুলে স্যারকে 'আদাব' জানালো পিন্টু।

ভিনসেন্ট স্যার রহস্যভরা গলায় বললেন, 'জানি তুমি খুব অবাক হয়েছো আমাকে দেখে। বলতো আমি কেন এসেছি?'

গত পরশু ইন্টার স্কুল ফুটবলে পিন্টুরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শেষের তিনটা খেলায় ভালো খেলার জন্য ফাইনাল খেলায় পিন্টু ছিলো দলের ক্যাপ্টেন। ওদের ক্যাপ্টেন ক্লাস টেনের বদরুল হাঁটুতে ব্যথা পেয়ে ফাইনাল খেলার দিন মাঠে নামতে পারেনি। সবাই ধরে নিয়েছিলো পিন্টুরা হারবে। গেম টিচার পর্যন্ত বিষণ্ন মুখে বলেছিলেন, 'জেতার দরকার নেই। ড্র করলেও মুখরক্ষা হয়।' অন্যরা বলেছে 'বদরুল মাঠে নেই, ডিফেন্স সামলাবে কে? আল্লা জানেন কয় গোল খেতে হয়!' সেই খেলায় পিন্টুর জন্যই ওদের টীম দুই এক গোলে জিতেছে। পিন্টু ভাবলো এরই জন্যে হয়তো ভিনসেন্ট স্যার ওদের বাড়িতে এসেছেন। লাজুক হেসে বললো, 'আমরা ফুটবলে ইন্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছি, সেজন্য এসেছেন।'

ভিনসেন্ট স্যার একটু অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা তাঁর মনে ছিলো না। তাছাড়া খেলাধুলায় কখনও তাঁর আগ্রহও ছিলো না। কথাটা মনে পড়ায় হা হা করে গলা খুলে হাসলেন। বললেন, ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়েছো, তার জন্য আমি কেন আসবো! ওটা তো বীরেন চৌধুরী স্যারের

এলাকা!'

কথার ফাঁকে পিন্টুর বাবা উঠে ভেতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এসেছেন। ভিনসেন্ট স্যার ওঁকে বললেন, 'বীরেন স্যার যখন আসেননি তখন আমিই বলি চৌধুরী সাহেব। আপনি নিশ্চয় শুনেছেন আপনার ছেলের অধিনায়কত্বে আমাদের ফুটবল টীম ইন্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে?'

মৃদু হেসে পিন্টুর বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, শুনেছি। সারাক্ষণ তো ওসব নিয়েই পড়ে থাকে।'

ভিনসেন্ট স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না, সারাক্ষণ ওসব নিয়ে থাকে না। তাই যদি থাকতো তাহলে আমাকে আজ আপনাদের বাড়িতে আসতে হতো না।'

স্যারের কথা শুনে পিন্টু মনে মনে প্রমাদ গুনলো। তবে কি ক্লাস টেন॥এর রবিউল গতকাল দুপুরের কথা স্যারকে বলে দিয়েছে? পিন্টুর কোনো দোষ নেই। দুপুরে টিফিনের সময় রতনকে নিয়ে বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের সামনে রয়েল ষ্টেশনারির দোকানে গিয়েছিলো পেন্সিল কিনতে। সেভেনথ পিরিয়ডে ড্রইং ক্লাস। ড্রইং-এর রহমতুল্লাহ স্যার বলে দিয়েছিলেন পারলে যেন ওরা ফোর বি পেন্সিল আনে। পেন্সিল কিনে দোকান থেকে বের হতেই রফিক, সমীর আর মন্টুর সঙ্গে দেখা। ক্লাসে ওদের প্লেস সবার নিচে, মন্টু তো গতবার প্রমোশনই পায়নি। পিন্টুকে দেখে ওরা সবাই, 'ক্যাপ্টেন,' 'ওস্তাদ,' 'দোস্ত' বলে হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। বললো, 'এত বড় একটা ম্যাচ জিতলি—চটপটি খাওয়া।'

ফাইনাল খেলা জেতার পর পিন্টুও মহা ফূর্তিতে ছিলো। সকালে বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে বন্ধুদের খাওয়াবে বলে। রতন আর ওর জন্য দুটো পেন্সিল কিনেছে ষোল টাকায়, বাকি টাকা তখন ওর পকেটে। মন্টুদের আবদার দেখে ওদের মানা করতে পারেনি। সবাই মিলে গার্লস স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে, চটপটি খেয়েছে। মন্টু আগের দিন ভিসিআর—এ দারুণ হাসির এক হিন্দি ছবি দেখেছিলো। হাত পা নেড়ে ওটার গল্প বলে সবাইকে ও হাসিয়ে মারছিলো। তখনই ক্লাস টেন-এর ক্যাপ্টেন রবিউল এসে হাজির। স্কুলের দিকেই যাচ্ছিলো, ওদের হল্লা শুনে ও তাকিয়ে দেখে পিন্টুও আছে সেখানে। কাছে এসে পিন্টুকে বললো, 'ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছিস নাকি! মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে যে আড্ডা মারছিস। দাঁড়া, আজই ব্রাদার হোবার্টকে গিয়ে বলবো!'

সেই থেকে পিন্টু ভয়ে ভয়ে আছে—এর জন্য কখন ডাক পড়ে! ভিনসেন্ট স্যার তাহলে বাড়ি পর্যন্ত এসেছেন এ কথা বলার জন্য? ভয়ে পিন্টুর গলা শুকিয়ে গেলো।

ভিনসেন্ট স্যারের গম্ভীর কথায় পিন্টুর বাবাও একটু ঘাবড়ে গিয়েছেন। শুকনো গলায় জানতে চাইলেন, 'পিন্টু কি স্কুলে অন্যায় কিছু করেছে?'

'না হামিদ সাহেব, পিন্টুর মতো ছেলে কখনও অন্যায় করতে পারে না। ও যা

ঃ কি গো পিন্টুর মা, একলগে পিকনিক করবা ··

করেছে সেটা একশবার ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেয়েও বড় ঘটনা। শুনে গর্বে আমার বুক ভরে গেছে।' এই বলে ভিনসেন্ট স্যার হরিমতিয়াদের সাহায্য করার জন্য পিন্টু আর রতন কিভাবে চাঁদা তুলেছে সব কথা খুলে বললেন। শেষে বললেন, 'হেডমাস্টার আমাকে বলেছেন আপনাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য।'

ভিনসেন্ট স্যার কথাগুলো যেভাবে বললেন শুনে রতন আর পিন্টুর বাবার বুক গর্বে ভরে গেলো। পিন্টুর বাবা বললেন, 'আমি তো ওর দিকে তেমন নজর দিতে পারি না। আপনাদের মতো শিক্ষকদের হাতে পড়েছে বলেই এমন হয়েছে।'

বাবার কথা শেষ হওয়ার আগেই পিন্টু আস্তে করে উঠে চলে গেছে ওর নিজের ঘরে। ওর কখনও মনে হয়নি হরিমতিয়াদের জন্য কিছু করাটা বিরাট কোনো ঘটনা। বরং ফুটবল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার! কিন্তু ভিনসেন্ট স্যার যেভাবে বললেন--শুনে ওর মাথা গুলিয়ে গেছে।

চা খেতে খেতে রতনের বাবা বললেন, 'রতন আমাকে কখনও এ কথা বলেনি।'

চা নিয়ে এসে পিন্টুর মা নাশতা তুলে দেয়ার জন্য বসেছিলেন। রতনের বাবার কথা শুনে বললেন, 'আসলে ছেলেরা আপনাদের ভয় পায় বলে কিছু বলে না। দিন পনেরো আগে পিন্টু কেন সন্ধ্যা অব্দি বাড়ি ফেরেনি বলে উনি রাগারাগি করলেন। হরিমতিয়াদের কথা সেদিনই আমি পিন্টুর কাছে শুনেছি। কলম কেনার পয়সা ওরা হরিমতিয়াদের দিয়ে এসেছে শুনে আমার বাজার খরচ থেকে রতন আর পিন্টুর কলম কিনে দিয়েছি।'

পিন্টুর মা'র কথা শুনে ভিনসেন্ট স্যার গলা খুলে হাসলেন। বললেন, 'দেখলেন তো হামিদ সাহেব! আপনারা ছেলেদের খবর না রাখলেও মায়েরা কিন্তু সব খবর ঠিকই রাখেন।'

পিন্টুর বাবা অভিমান ভরা গলায় পিন্টুর মাকে বললেন, 'আমাকে বললে বুঝি ওদের কলম কিনে দিতাম না!'

পিন্টুর মা মুখে টিপে হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, কথাটা মনে থাকবে। এবার থেকে বলবো।'

ভিনসেন্ট স্যার আরেক দফা হাসলেন।

সেদিন আর দাবা খেলা জমেনি। ভিনসেন্ট স্যার নটা পর্যন্ত ছিলেন। আগেকার দিনের মানুষ কত ভালো ছিলো, দিন দিন মানুষ স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে— তিনজনে বসে এসব গল্প করলেন। নটার সময় উঠলেন ভিনসেন্ট স্যার। যাবার সময়—'আপনাদের দাবা খেলাটা আজ মাটি করে দিয়ে গেলাম। এবার নিশ্চই আমার মন্ডুপাত করবেন।' বলে হা হা করে হাসলেন। পিন্টুর বাবা বিনীত গলায় বললেন, 'এসব কী বলছেন স্যার। দাবা তো রোজই খেলি। আপনার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য কি রোজ হবে?'

'লোভ দেখালে রোজ না হলেও মাসে একবার এসে আড্ডা দিয়ে যাবো। ভারি

ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে গল্প করে।'

'মাসে একবার কেন, আপনার যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবেন।' এই বলে পিন্টু আর রতনের বাবারা ভিনসেন্ট স্যারকে এগিয়ে দিলেন।

রতনের বাবা রাস্তা থেকে বিদায় নিলেন। ছেলের জন্য তাঁরও গর্ব হচ্ছিলো। সারাদিন কাজের ঝামেলায় থাকেন। সন্ধ্যায় সংসারের ঝামেলার কথা শুনতে হয় বলে আড়ত থেকে বাড়ি ফিরে আবার বেরিয়ে পড়েন। রতনের মাই এত কাল ধরে সংসারের সব কিছু সামলাচ্ছেন।

ঘরে ঢুকে রতনের বাবা গলা তুলে রতনের মাকে ডাকলেন, 'কই গো, তুমি গেলা কই?'

রতনের মা রান্নাঘরে ছিলেন। রতনের বাবার খুশিভরা গলা শুনে অবাক হলেন। বহুদিন এ ধরনের গলা তিনি শোনেন নি। ঘরে এসে নিচু গলায় জানতে চাইলেন, 'কি ওইছে?'

হাসি মুখ করে রতনের বাবা বললেন, 'তোমার রতইন্যার কারবার দেখছো?'

রতন পাশের ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিলো। নিজের নাম শোনা মাত্র ওর কান দুটো খাড়া হয়ে গেলো। মা বললেন, 'ক্যান কী করছে রতইন্যায়?'

ভিনসেন্ট স্যার যেভাবে হরিমতিয়ার গল্প ওঁদের বলেছিলেন সবটুকু রতনের মাকে জানালেন। শেষে বললেন, 'অগো হ্যাডমাস্টার স্কুলের ভিনসেন্ট স্যাররে পাঠাইছে এই খবর আমাগো কওনের লাইগা। আমার লগে পিন্টুগো বাড়িত দ্যাখা না ওইলে স্যারে আমগো বাড়িতও আইতো। কারবার দেখছ পোলার!'

ততক্ষণে রতনের ঠাকুরমাও এসে ঢুকেছেন ঘরে। রতনের বাবা মহা উৎসাহে—'মা হুনছ রতইন্যার কথা,' বলে আরেক দফা তাঁর মাকেও ঘটনাটা বললেন। ঠাকুরমা সব শুনে বললেন, 'রতইন্যায় পুরা তর বাপের স্বভাব পাইছে। তুই তহন ছোট আছিলি ঘোতনা! তর বাপে দুই কুষ্ট রুগিরে আইন্যা ঘরে তুললো। আমার হাউড়ির কী চিল্লচিল্লি। তর বাপে কারও কথা হুনলে তো!'

পিন্টুর মতো রতনও কখনও ভাবেনি হরিমতিয়াদের এভাবে সাহায্য করার জন্য কেউ ওদের প্রশংসা করবে। বরং উল্টোটাই ওরা ভেবেছিলো, যেমন কি না ওদের ক্লাসের রেজা বলেছে। যে বাড়িতে নিজেকে সব সময় অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে, যে বাবা মা উঠতে বসতে ওকে গালমন্দ করেছেন, ওকে নিয়ে ওঁদের উচ্ছ্বাস দেখে আনন্দে চোখের জল ধরে রাখতে পারলো না রতন। ঠাকুরমা তখন ওর মাকে বলছেন, 'হুন বউ, রতন্যারে খাওনের সময় অখন থেইকা একটা ডিম দিবা। পরীক্ষা সামনে। আমারে নিত্য দুধ দ্যাওন লাগবো না। বয়স ওইছে, দুধ অখন আমার প্যাটে সয় না।'

ফুটবলে স্কুল টীমকে চ্যাম্পিয়ন বানাবার জন্য আর হরিমতিয়াদের মতো গরিব দুঃখি মানুষকে সাহায্য করার জন্য প্রশংসা শুনতে শুনতে পিন্টু আর রতনের

পরীক্ষার প্রস্তুতিও আগের চেয়ে অনেক ভালো হলো। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষায় পিন্টু ফোর্থ আর রতন সিক্সথ হওয়াতে ওরা নিজেরাই অন্যদের চেয়ে বেশি অবাক হলো। রেজা এবার সেকেণ্ড হয়েছে ফার্স্ট হয়েছে, ইউসুফ। পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে রেজা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেছে, 'মনে হয় মেথরনীদের অভিশাপ লেগেছে আমার ওপর।' বখতিয়ার বলেছে, 'পিন্টুকে স্যারেরা নম্বর ঘুষ দিয়েছেন ইন্টারস্কুল ফুটবল ফাইনাল জেতার জন্য।'

ওদের রিপোর্ট কার্ড দিতে গিয়ে স্কুল টিচার বলেছেন, 'পরীক্ষার খাতা আমি নিজে দেখেছি। ইচ্ছে করলেই ভালো করতে পারিস তোরা। এখন থেকে ছয়ের নিচে নামা চলবে না।'

রিপোর্ট কার্ড নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় রতন পিন্টুকে বললো, 'রেজা কি বলছিলো শুনেছিস?'

'হরিমতিয়াদের অভিশাপে ও সেকেণ্ড হয়েছে।'

'তাহলে বলতে হবে হরিমতিয়াদের আশীর্বাদে আমরা ভালো করেছি।'

'পরীক্ষায় ভালো খারাপের মধ্যে কারও অভিশাপ আশীর্বাদের কিছু নেই। ইউসুফের চেয়ে রেজা খারাপ করেছে তাই সেকেণ্ড হয়েছে। আমরা আগের চেয়ে প্রিপারেশন ভালো করেছি, তাই রেজাল্টও ভালো হয়েছে।'

'তারপরও এতে হরিমতিয়াদের হাত আছে।'

'কিভাবে?'

'সেদিন তোদের বাড়ি থেকে ভিনসেন্ট স্যারের কথা শুনে এসে বাবা আমাকে রীতিমতো হিরো বানিয়ে দিয়েছেন। তারপর দেখি পড়ার সময় কেউ দোকানে যেতে বলে না, খাওয়ার সময় ভালোটা আমার পাতে তুলে দেয়, মেজদা নিজে থেকে অংক আর বিজ্ঞান বুঝিয়ে দিলো। হরিমতিয়াদের উপকার না করলে কি এসব হতো!'

'তার মানে তুই বলতে চাইছিস, এর পর থেকে পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য হরিমতিয়াদের মতো কাউকে খুঁজে বের করে তাদের সাহায্য করতে হবে?'

'ঠাট্টা করছিস কেন? আমরা কি পরীক্ষার ফল ভালো করার মতলবে ওদের সাহায্য করেছি?

'সে কথা তো আমিও বলছি। কাউকে সাহায্য করতে চাইলে বিনা মতলবে করবি। মনে করবি এটা আমাদের দায়িত্ব। নলিনী স্যার কী বলেন ভুলে গেছিস? একমাত্র মানুষই পারে নিঃস্বার্থভাবে একে অন্যের বিপদে পাশে এসে দাঁড়াতে!'

'তবু একটুখানি স্বার্থ থেকেই যায়!'

'কিভাবে?'

'নলিনী স্যার একথাও বলেছেন ভালো কাজ হচ্ছে মনের সাবানের মতো। আমাদের মনে যদি ময়লা জমে ভালো কাজ করলে সেটা সাবানের মতো মনের ময়লা দূর করে দেয়।'

'ওসব তত্ত্ব কথা রাখ। নলিনী স্যারের কথা শুনে মনে হয় এসব লিখে একটা বই করলে মন্দ হয় না।'

'তত্ত্ববোধিনী কিংবা তত্ত্বপঞ্জিকা নাম দেয়া যেতে পারে।'

'তত্ত্বকৌমদিনী নামটাও মন্দ নয়।' বলতে গিয়ে হেসে ফেললো রতন।

পিন্টু হেসে প্রসঙ্গ পাল্টালো—'ভোলা কবে যাবো ঠিক করেছিস?'

'তোকে বলিনি বুঝি! বাবা বড়দিকে চিঠি লিখে দিয়েছেন, সামনের রোববারে যাচ্ছি আমরা।'

'তোদের বাড়ির আর কেউ যাবে নাকি?'

'না, শুধু তুই আর আমি।'

'দারুণ মজা হবে। আজ পর্যন্ত বাবা মাকে ছাড়া ঢাকার বাইরে কোথাও যাইনি।'

'গত বছর আমি লৌহজং মামার বাড়ি একা গেছি।'

'সে তো এইটুকুন পথ। কদিন থাকবি ঠিক করেছিস?'

'সামার ভ্যাকেশন তো পুরোটা পড়ে আছে। এক মাস থাকলেই বা অসুবিধে কী?'

'না রে! দশ বারোদিনের বেশি থাকা যাবে না। বাবা মা চিন্তা করবেন। তাছাড়া ভ্যাকেশনে ক্রিকেট টীমের নেট প্র্যাকটিস হবে।'

'আগে যাই তো! তারপর দেখা যাবে।'

বাড়িতে পিন্টু আর রতনের রেজাল্ট দেখে সবাই দারুণ খুশি! দুপুরে খাওয়ার সময় পিন্টুর মা বললেন, 'পরীক্ষায় ভালো করেছিস, শুক্রবার দিন তোর বাবা বাসায় থাকবেন, সেদিন তোর দু চারজন বন্ধুকে ডাক, খাইয়ে দিই।'

'দু চারজন লাগবে না মা!' পিন্টু ওর মাকে বললো, 'তুমি বরং রতনদের বাড়ির সবাইকে বলো! ও বাড়িতে গেলে রতনের মা, ঠাকুরমা যা করেন না!'

'ওদের তো বলবোই। পাড়ায় আপনজন বলতে তো ওরাই আছে। তোদের ঐ ভীম সেন স্যারকেও বলতে পারিস। সেদিন যে এসেছিলেন?'

'ভীম সেন নয় মা ভিন সেন্ট!' পিন্টু হেসে বললে 'ভিনসেন্ট রোজারিও হচ্ছে ওঁর নাম। ঠিক আছে, ওঁকেও বলা যাবে। বাবাদের সঙ্গে ওঁর ভালো জমে।'

সন্ধ্যের পর পিন্টুর বাবা যেই বেরোলেন রহমত ব্যাপারীর গদির দিকে, পিন্টুর মাও বেরোলেন রতনদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করার জন্য। শুক্রবারে নেমন্তন্নের কথা বলতেই রতনের মা আর ঠাকুরমা একসঙ্গে হেসে ফেললেন। ওঁদের সঙ্গে গলা মেলালো রতনের সেজদি তপতী আর ছোড়দি কেতকী।

পিন্টুর মা হতভম্ব হয়ে চারপাশে তাকালেন। রতনের মাকে বললেন, 'এতে এত হাসির কী হলো দিদি! আপনারা তো আমাদের বাড়িতে আগেও খেয়েছেন।'

'সে কথা নয় বোন!' হাসতে হাসতে রতনের মা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন দেখে আমরা ঠিক করেছি আপনাদের সবাইকে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন

করবো।'

এ কথা শুনে পিন্টু মা'র মুখে হাসি ফুটলো। বললেন, 'এ শুক্রবারে আমাদের বাড়িতে হোক। আমি পিন্টুর বাবাকে বলে ফেলেছি। আপনারা পরের শুক্রবারে করুন।'

রতনের ঠাকুরমা বললেন, 'না গো হাসির মা। পরের শুক্কুরবার ওইলো গিয়া আমার একাদশী। আমারে বাদ দিয়া তোমরা খাইবা, এইটা কেমন কথা!'

তপতী বললো, 'অ ঠাম্মা, দুই বাড়ি মিল্যা এক লগে করলে অয় না! পিকনিক পিকনিক মনে ওইবো।'

ঠাকুরমা হেসে বললেন, 'এইটা তুই মন্দ কস নাই। কি গো হাসির মা, একলগে পিকনিক করবা? তোমারও খরচ বাঁচে, আমারও বাঁচে।'

পিন্টুর মা হেসে বললেন, 'খরচের কথা উঠছে কেন মাসিমা? ঠিক আছে, আমি সব জোগাড় করে রাখবো। আপনি আর দিদি গিয়ে রান্নাটা চাপিয়ে দেবেন।'

'সব ক্যান তুমি জোগাড় করবা? তাইলে আর পিকনিক ওইবো ক্যামনে! মাছ আর মিষ্টি আমি লইয়া যামু। তুমি পোলাও আর মুরগি করবা!'

'এ রাম! ঠাম্মা। তুমি মুরগি খাইবা?' হাসতে হাসতে বোনের গায়ে গড়িয়ে পড়লো রতনের ছোড়দি কেতকী।

'মর ছেমরি, আমি ক্যান মুরগি খামু? খাইবো তর বাপে। ছোড থাকতে ঘোতনার নাম রাখছিলাম শিয়াল। মুরগি ছাড়া ভাত খাইতে চাইতো না।'

সব কথা পাকা করে পিন্টুর মা বাড়ি ফিরলেন।

রতন আর পিন্টু তখন সূত্রাপুর বয়েজ ক্লাবে। দু'দিন পর লালবাগের সঙ্গে ওদের ফুটবল টুর্নামেন্ট। আজ বিকেলে খবর এসেছে সূত্রাপুরের সেন্টার ফরোয়ার্ড মাখনের স্ট্রং ডায়রিয়া হয়েছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বারোবার বাথরুমে গেছে। বিছানায় শুয়ে চিঁচিঁ করছে আর ওরস্যালাইন খাচ্ছে।

ফাইনাল খেলার দু' দিন আগে এ খবর শুনে সূত্রাপুরের ক্যাপ্টেন লালু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। কত কষ্ট করে তিন তিনটা সেকেণ্ড ডিভিশন টীমকে হারিয়ে, একটাকে পয়সা দিয়ে বসিয়ে এ পর্যন্ত এসেছে। শেষে কিনা তীরে এসে তরী ডুববে! ওদের একজন ইন্টারস্কুল ফুটবল কম্পিটিশনের ফাইনালে পিন্টুর খেলা দেখেছিলো। বললো 'অই ক্যাপ্টেন, কাগজিটোলার পিন্টুরে লইয়া লও। তোমার আমাশা রুগির থেইকা বহুৎ ভালা খেলবো।'

পিন্টুর কথা লালুও শুনেছে। তক্ষুণি একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দিলো ওকে ডাকার জন্য। পিন্টু তখন রতনেক নিয়ে ওদের একতলা বাড়ির ছাদে বসে নারকেল দিয়ে ঘিয়ে ভাজা চিড়ে খাচ্ছিলো। সূত্রাপুর বয়েজ ক্লাব সেকেণ্ড ডিভিশন লীগে খেলে। সেখান থেকে ডাক আসতে পিন্টুর খুশি আর ধরে না। রতনকে সঙ্গে নিয়ে তখনই চলে এলো ক্লাবে। লালুর প্রস্তাবে ও এক কথায় রাজী। ক্লাবের সেক্রেটারি হাশমতউল্লা পিন্টুকে বললো, 'বাইরের পিলিয়ার আমাগো ক্লাবে

আগেও খেলছে। তোমারে আমরা বুধবারের খেলার লাইগা একস ট্যাকা দিমু। আর গোল পিছে পঞ্চাস ট্যাকা। হেট্রিক করবার পারলে তিনস ট্যাকা। আমার কাছে চুরি চোট্টামির কাম পাইবা না।'

টাকার কথা পিন্টু স্বপ্নেও ভাবেনি। ভেতরে ভেতরে খুশিতে ফেটে পড়লেও বাইরে প্রকাশ করলো না। গম্ভীর হয়ে বললো, 'প্র্যাকটিস কবে থেকে?'

'কাইল সকালে, ধুপখোলার মাঠে!'

'ঠিক আছে, সকালে আসবো।' বলে সেক্রেটারিকে সালাম দিয়ে পিন্টু আর রতন ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলো!

রাস্তায় নেমে রতন খুশিতে জড়িয়ে ধরলো পিন্টুকে—'তুই সেকেণ্ড ডিভিশন টীমে খেলবি! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

পিন্টু হেসে বললো, 'খেলে টাকা পাবো, এমন কথা আমিও ভাবিনি। বল এটাও হরিমতিয়াদের জন্য!'

পথচারীদের চমকে দিয়ে দুই বন্ধু হো হো করে হেসে উঠলো।

চার

খেলা ছিলো রহমতগঞ্জের মাঠে। বুধবার চারটায় প্লেয়ার আর সাপোর্টার নিয়ে দুটো বড় বাসে করে পিন্টুরা এসে মাঠে নামলো। লালবাগ ক্রীড়াচক্রের প্লেয়াররা আগেই এসে দুটো বল নিয়ে মাঠে ওয়ার্ম আপ করছে। ওদের সাপোর্টার সূত্রাপুরের তিনগুণ হবে। এলাকাটাও বলতে গেলে ওদেরই।

রতন ঘাবড়ে গেলো লালবাগের প্লেয়ারদের সাইজ দেখে। সূত্রাপুরের টীমে যদিও পিন্টু বয়সে সবার ছোট, তবু দু'দিন প্র্যাকটিস দেখে রতনের মনে হয়েছে ও এখানে খুব একটা বেমানান নয়। পিন্টু যে রকম বল পায়ে নিয়ে তীরের মতো ছুটতে পারে সূত্রাপুরের আর কেউ দৌড়ে ওর সঙ্গে পারে না। তাছাড়া নব্বই মিনিট একটানা দমও রাখতে পারে ও। কিন্তু লালবাগের ছেলেদের যে তাগড়া শরীর—কমন বল চার্জ করতে গিয়ে যদি বেকায়দায় পিন্টুর গায়ে বাড়ি লাগে ওকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না।

সূত্রাপুরের একজন বললো, লালবাগ নাকি ওদের টীমে তিনজন ফার্স্ট ডিভিশন প্লেয়ার এনেছে। লালবাগের টীমের চেহারা দেখে ক্যাপ্টেন লালু জেতার আশা ছেড়ে দিলো। বললো, 'ফার্স্ট ডিভিশনের ফরোয়ার্ড তিনটারে কড়া মার্কিং-এ রাখবো আমগো মিড ফিল্ডাররা। বেশি উপরে উইঠা আইলে এমনে যদি আটকাইতে না পারো মুখে ছ্যাপ মাইরা দিবা, দরকার ওইলে প্যান্ট টাইনা খুইলা দিবা! এমনভাবে করবা য্যান রেফারি কিছু বুঝবার না পারে।'

লালুর ব্রিফিং পিন্টুর একটুও ভালো লাগলো না। মাথা নিচু করে চুপচাপ শুনে গেলো শুধু। ও জানে জেতার জন্য কিভাবে খেলতে হয়। জয় পরাজয় নিয়ে রতন মোটেই ভাবছিলো না। মাঠে আসার পর থেকে সারাক্ষণ ও ভাবছিলো পিন্টুকে

অক্ষত শরীরে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে কিনা। মনে মনে ঠিক করলো, এ যাত্রা যদি রক্ষা পায় আর কোনোদিন এ ধরনের ধাড়িদের টুনার্মেন্টে পিন্টুকে খেলতে দেবে না।

টুর্নামেন্টার নাম ছিলো 'হাজী খয়রাত হোসেন গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট।' খয়রাত হোসেন এই এলাকার নাম করা চামড়ার ব্যবসায়ী। রহমতগঞ্জ ক্লাবে মোটা টাকা চাঁদা দেন। চার বছর হলো খবরের কাগজে নাম ছাপার জন্য নিজের নামে এই গোল্ডকাপ চালু করেছেন। মস্ত বড় শরীর, তার চেয়ে বড় একটা পেট নিয়ে সাদা পাঞ্জাবি, সাদা লুঙ্গি পারে হাজী খয়রাত হোসেন বসেছিলেন লাল সাদা শামিয়ানার নিচে। তাঁর সামনে টেবিলে দুটো কাপ। বড়টা সোনার, যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে তাদের জন্য, আর ছোটটা রূপার, রানার্স আপের জন্য। তাঁর দুপাশে এলাকার গণ্যমান্য লোকজনরা বসেছে। সাধারণ পাবলিক বসেছে সাইড লাইনের পাশে। দুই টীমের কর্মকর্তারা বসেছে ফুটবল মাঠের মাঝ লাইন বরাবর দুই দিকে।

ঠিক সাড়ে চারটায় রেফারি খেলা শুরুর বাঁশি বাজালো। টসে জিতেছিলো সূত্রাপুর। সেন্টারে রাখা বলে প্রথম পা ছোঁয়ালো পিন্টু। খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইড লাইনে কর্মকর্তাদের পাশে বসা রতন মনে মনে দেব দেবীদের নামে মানৎ করতে লাগলো, যাতে পিন্টু অক্ষত থাকে। ও আবার দেব দেবী মানে, পিন্টু'র মতো নাস্তিক নয়। সব নাম শেষ হয়ে যাওয়ার পর হরিমতিয়ার কথা মনে পড়লো রতনের। মনে মনে বললো, 'হরিমতিয়া, তোমরা কোথায় আছো জানি না। তোমাদের পিন্টুর আজ বড় বিপদ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো ও যেন অক্ষত থাকে।'

লালবাগ খুব হেলাফেলা করে খেলা শুরু করেছিলো। দলে তিনটা ফার্স্ট ডিভিশন প্লেয়ার, লীগে সব সময় ওপরের দিকে থাকে--সূত্রাপুরকে পাত্তা দেয়ার ওদের কোনো কারণ ছিলো না। মিনিট পনেরো পর লেফট উইং-এর কাছ থেকে গড়ানো একটা বল পেয়ে পিন্টু সোজা লালবাগের পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ঢুকে গেলো। ওদের ব্যাক কিছু বোঝার আগেই ওকে ডজ দিয়ে কড়া শটে গোলপোস্টের বাম দিক ঘেঁষে বলটা সোজা নেট-এ পাঠিয়ে দিলো।

সূত্রাপুরের সাপোর্টারদেরও বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগলো ওদের দলের নতুন খেলোয়াড় পিন্টু সত্যি সত্যি গোল করেছে। রতন 'গো-ও-ল' বলে চিৎকার করে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে সূত্রাপুরের চার পাঁচটা প্লেয়ার ছুটে গিয়ে পিন্টুকে জড়িয়ে ধরলো।

গোল দিতে পেরে সূত্রাপুরের ছেলেদের খেলার ধার বেড়ে গেলো। বল একবার ওদের পায়ে পড়লে ছাড়িয়ে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ছিলো লালবাগের জন্য। দু'বার কমন বলে চার্জ করতে গিয়ে ওদের দুই ফার্স্ট ডিভিশন বেশ ব্যথা পেয়েছিলো। এরপর থেকে ওরা তিনজন গা বাঁচিয়ে খেলতে লাগলো। কদিন বাদে ওদের লীগের খেলা। এক হাজার টাকার খ্যাপ খেলতে এসে হাত পা ভাঙতে ফার্স্ট

ডিভিশনের ওরা কেউ রাজী নয়। সাইড লাইন থেকে লালবাগের কোচ সমানে চ্যাঁচাতে লাগলো। কোনো লাভ হলো না। হাফ টাইমের পাঁচ মিনিট আগে কর্ণার পেয়ে সূত্রাপুরের ক্যাপ্টেন লালু আরেকটা গোল দিয়ে দিলো।

হাফ টাইমের পর সূত্রাপুর শয়তানি শুরু করলো। বল পেয়ে লম্বা লম্বা কিক মেরে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে সময় নষ্ট করতে লাগলো। পিন্টু অবশ্য এ ধরনের নেগেটিভ খেলা পছন্দ করে না। বল পেলেই ও গোল দেয়ার চেস্টা করছিলো। এরই ভেতর লালবাগ এক ফাঁকে এক গোল শোধ করে দিলো। সূত্রাপুরের ক্যাপ্টেন বুঝে গেলো লালবাগের সঙ্গে নেগেটিভ ফুটবল খেলা চলবে না। সবাই সিরিয়াস হয়ে আক্রমণের পর আক্রমণ চালালো লালবাগের ডিফেন্স লাইনের ওপর। ওদের ফার্স্ট ডিভিশনের দুজনই ছিলো ডিফেন্সে। পিন্টু আগেই লক্ষ্য করেছিলো ফার্স্ট ডিভিশনের ওরা কায়দা করে গা বাঁচিয়ে খেলছে। খেলা শেষ হওয়ার দুই মিনিট আগে সেই সুযোগটাকে ও কাজে লাগালো। পায়ে বল পেয়ে এমনভাবে ফার্স্ট ডিভিশনের ডিফেণ্ডারের দিকে তেড়ে গেলো, দেখে মনে হলো বল নয় ওদের প্লেয়ারকেই লাথি মেরে গোল পোস্টে ঢুকিয়ে দেবে। পিন্টু কাছে আসতেই ওকে বাধা দেয়ার বদলে লালবাগের ডিফেণ্ডাররা ছিটকে এক পাশে সরে গেলো। দু' পা এগিয়ে গোলকিপার কিছু বোঝার আগেই বাঁ পা দিয়ে ডান দিকের বার ঘেঁষে বলটা গোলপোস্টে ঢুকিয়ে দিলো পিন্টু।

রতন চিৎকার করে ওর পাশে বসা সূত্রাপুরের দাড়িওয়ালা সেক্রেটারিকেই জড়িয়ে ধরলো। দু' মিনিট পর রেফারির খেলা শেষের বাঁশী বাজলে দেখা গেলো পিন্টু সূত্রাপুরের সমর্থকদের কাঁধের ওপর।

গোল্ড কাপ নিয়ে হই হই করে ক্লাবে আসার পর সেক্রেটারি হাশমতউল্লা পিন্টুকে পুরো তিনশ টাকাই দিলো। বললো, 'যেই খেলা দ্যাহাইছ ফাণ্ডে ট্যাকা থাকলে তোমারে হাজার টাকা দিতাম।'

ক্যাপ্টেন লালু বললো, 'পিন্টু আমাগো টীমে রেগুলার খেলবা?'

হাশমতউল্লা বললো, 'হ পিন্টু, এইবার লীগে আমরা থার্ড না ওইলেও ফোর্থ ওইবার চাই। চইলা আহ আমগো টীমে।'

পিন্টু মৃদু হেসে মাথা নাড়লো—'গ্র্যাজুয়েশনের আগে এ কথা বললে বাবা কেটে দু টুকরো করে ফেলবেন।'

'বি এ পাশ কইরা তো বেশি ওইলে দ্যাড় দুই হাজার ট্যাকার ক্যারানি ওইবা। তোমার খেলার যা নমুনা দেখলাম, দুই বছর এই রকম চালাইতে পারলে দেখবা ফার্স্ট ডিভিশনঅলারা তোমারে লয়া টানাটানি করতাছে। তোমারে চিনতে আমার ভুল অয় নাই। লাইগা থাকতে পারলে একদিন তুমি লাখ লাখ ট্যাকা কামাইবার পারবা।'

একজন মন্তব্য করলো, 'হাশমত ভাই পাক্কা জুহুরি। আসল মাল ঠিক চিনা ফালায়।'

লালু বললো, 'লীগে যদি নাও খ্যালো, টুর্নামেন্টে ডাকলে আইবা তো পিন্টু?'

পিন্টু বললো, 'ক্লাসের অসুবিধে না হলে আসবো।'

হাশমতউল্লা বললো, 'অখন থেইকা খ্যাপ পিচে তোমারে একস—না দুইস ট্যাকা দিমু। গোলের লাইগা একস।'

পিন্টু কোনো কথা না বলে শুধু হাসলো। রতন বললো, 'বাড়ি যাবি না? সাতটা বেজে গেছে।'

পিন্টু উঠে দাঁড়ালো। হাশমতউল্লা ব্যস্ত গলায় বললো, 'অখন বাড়ি যাইবা কি! পালোয়ানের দোকান থেইকা মোরগ পোলাউ আনবার দিছি, খায়া যাইবা।'

পিন্টু মাথা নাড়লো—'না হাশমত ভাই। বাড়িতে বলে আসিনি এত রাত হবে।'

ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় লালু পিন্টুকে আবারও মনে করিয়ে দিলো ওদের ক্লাবে খেলার কথা।

বাড়ি যেতে যেতে পিন্টু বললো, 'জীবনে প্রথম রোজগার করলাম! তোর জন্য কী কিনি বলতো রতন?'

রতন হেসে বললো, 'আমার কিছু লাগবে না। টাকা জমিয়ে রাখ। কখন কী দরকার হয় কে জানে।'

'টাকা হাতে থাকলেই আমার খরচ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। জমাবো কার জন্য?'

'কখনও যদি হরিমতিয়ারা ফিরে আসে? কিংবা ওদের মতো আর কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়!'

'কথাটা মন্দ বলিসনি। পিন্টু মৃদু হেসে বললো, 'ঠিক আছে, দুশ টাকা চ্যারিটি ফাণ্ডে থাকবে। একশ টাকা আমাদের হাত খরচ। তুই আর আপাত্তি করিস না দোস্ত।'

রতন কোনো কথা না বলে শুধু হাসলো।

পিন্টুদের বাসায় ফুটবল খেলে টাকা পাওয়ার খবরটা রতনই ফাঁস করলো। পিন্টুর মা শুনে অবাক হয়ে গেলেন—'বলিস কি রে। এই টুকুন ছেলেকে ফুটবল খেলার জন্য টাকা দিলো!'

পিন্টুর বড় বোন হাসি এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো—'তুই এত ভালো খেলিস ভাইয়া! কাল তোদের আমি সিনেমা দেখাবো।'

পিন্টু নিরীহ গলায় বললো, 'শুধু আমাদের দেখাবে? ইরফান ভাইকে দেখাবে না?'

হাসি অবাক হয়ে বললো, 'ইরফানকে কেন দেখাবো? ও কি পরীক্ষায় ভালো করেছে না ফুটবল ম্যাচ জিতেছে?'

রতন বললো, 'তুমি তো জানো আপু, ইরফান ভাইই প্রথম হরিমতিয়াদের ফাণ্ডে দশ টাকা চাঁদা দিয়েছে।'

ঃ পিন্টু, আমগো টীমে রেগুলার খেলবা?

'দশ টাকা চাঁদার জন্য ইরফানকে ছবি দেখাতে হবে?'

হাসির কথা শেষ না হতেই ইরফান এসে ঘরে ঢুকলো। হাতে চামড়ার পেটমোটা ব্যাগ। পিন্টু ওকে দেখে অবাক হয়ে বললো, 'আরে ইরফান ভাই! এ সময়ে আপনি এখানে?'

ইফান হেসে বললো, 'পাশের বাড়ির পাটোয়ারি গিন্নিকে দেখতে এসেছিলাম। তোমাদের গলা আর আমার নাম শুনে ঢুকে পড়লাম।'

'আপনি আমাদের কথা সব শুনেছেন?'

'হ্যাঁ শুনেছি। তোমার আপু যে কী ভয়ানক কঞ্জুস আজ জানলাম। ঠিক আছে, ছবি আমি দেখাবো তোমাদের। কারও বেলায় কঞ্জুসি করবো না।'

হাসি মুখে টিপে হাসলো, 'রোগীদের গলাকাটা পয়সা দিয়ে সবাই হাজী মহসিন সাজতে পারে।'

মা রান্নাঘরে গিয়েছিলেন। ইরফানের গলা শুনে বেরিয়ে এসে বললেন, 'শুক্রবার দুপুরে তুমি আমাদের বাসায় খাবে ইরফান।'

'উপলক্ষ্য কী খালাম্মা?'

'উপলক্ষ্য আর কী! রতন আর পিন্টু পরীক্ষায় ভালো করেছে। আজ আবার ফুটবল খেলে তিনশ টাকা পেয়েছে। আমরা সবাই পিকনিক করবো। সকাল সকাল চলে এসো।'

'ফুটবল খেলার কথা তো শুনিনি!'

ইরফানকে পিন্টুর ফুটবল টুর্নামেন্ট খেলার ঘটনাটা খুলে বললো রতন। কিভাবে গোল করেছে আর হাশমতুল্লারা কী বলেছে সেটাও বলতে ভুললো না।

ইরফান প্রশংসাভরা গলায় বললো, 'পিন্টু, তুমি এত ভালো খেলো, কোনো দিন তো বলোনি!'

পিন্টু লাজুক হাসলো, 'এ আর এমন কী!'

ইরফান ঘড়ি দেখে বললো, 'বাব্বাহ, সাড়ে আটটা বাজে। এখন যাই, রোগীরা বসে আছে। পিন্টু, তোমার আগামী খেলা যার সঙ্গেই হোক আমি দেখবো। আগে থেকে জানাতে ভুলো না। যাই হাসি।'

ইরফান ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর পিন্টু বললো, 'আপু, তোমার সিনেমা দেখানোর টাকাটা তো বেঁচে গেলো। ওটা দিয়ে এখন কী করবে?'

'কী করবো এখন বলবো না। পরে দেখতে পাবি।' এই বলে হাসি ওর ঘরে ঢুকলো।

রতন বললো, 'এবার যাই রে পিন্টু! রাত অনেক হয়েছে।'

'চল তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' বলে গলা তুলে পিন্টু বললো, 'মা আমি রতনদের বাসায় যাচ্ছি।'

শুক্রবার রতন আর পিন্টুকে উপলক্ষ্য করে ওদের দুই বাড়ি মিলে উৎসব

করছে—এ নিয়ে ওরা যতবার ভেবেছে ততবারই রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। রতন মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে এ্যানুয়াল পরীক্ষায় ওকে যেভাবেই হোক থার্ড হতে হবে।

পিন্টুদের বাড়ির পেছনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিলো। পুরোনো দুটো আম গাছ আর চারটা নারকেল গাছের ছায়া প্রায় সারাদিনই পড়ে থাকে সেখানে। হাসি একবার সেখানে সবজির বাগান করে সুবিধে করতে পারেনি। ছায়াতে আদা আর হলুদ ছাড়া অন্য কিছু হয় না। পিন্টুরা আগেও কয়েকবার এ জায়গায় পিকনিক করেছে রতনদের সঙ্গে। যে জন্য চুলো কোথায় হবে, থালা বাসন ধোয়া মোছা আর রান্নার আয়োজন কিভাবে করতে হবে, এটা সবারই জানা। সকালে নটা না বাজতেই রতনদের বাড়ির সবাই এসে গেলো।

রান্নার দায়িত্ব রতনদে আর পিন্টুর মার ওপর। রতনের ঠাকুরমা অল্প দূরে মোড়ায় বসে তদারকি করছিলেন। দুটো আলাদা চুলোর একটায় মাছ আর মাংশ, অন্যটায় পোলাও আর নিরামিষ রান্না হবে। হাসি, তপতী আর কেতকী তরকারি কোটা, মশলা বাটা এসব করছিলো।

আগের পিকনিকে মুদির দোকানে টুকটাক জিনিস আনতে রতন আর পিন্টু যেতো। আজ রতনের মেজদা স্বপন নিজে থেকে এসে বলে গেছে, 'কিছু আনতে টানতে হলে বোলো, আমরা বাইরের বারান্দায় আছি।'

পিকনিক নিয়ে আগের দিন থেকেই রতন আর পিন্টু উত্তেজনার আগুনে গণগণ করে জ্বলছিলো। সেই আগুনে সকাল বেলা ঘি ঢেলেছে রতনের বড়দা যতীন আর পিন্টুর আদরের আপু হাসি। যতীন ওদের দু'জনকে দুটো চাইনিজ ফাউন্টেন পেন দিয়েছে। হাসি দিয়েছে দুটো নকশা করা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবি দেখে রতন উত্তেজিত গলায় পিন্টুকে বলেছে, 'নিজেদের কেমন রাজা রাজা মনে হচ্ছে না!'

উত্তেজনার আগুন আরেকবার লকলক করে উঠলো যখন ইরফান ওদের জন্য দুটো জিনস-এর প্যান্ট আর প্রিন্টেড সুইস ভয়েলের দুটো শার্ট আনলো। এগুলো দেখে রতন আর পিন্টু দু'দিক থেকে ইরফানকে যেভাবে জড়িয়ে ধরলো—বেচারার দম বন্ধ হয়ে মরার দশা হলো। আগের দিন বিকেলে ইরফান দু' বাড়ির ছেলে মেয়েদের সবাইকে মধুমিতায় নিয়ে ওয়াল্ট ডিজনীর ছবি 'ইন সার্চ অব ক্যাস্টাওয়ে' দেখিয়েছে। তারপর আবার প্যান্ট শার্ট আনবে এটা স্বপ্নেও ভাবেনি ওরা। পিন্টুর কাছে ঈদের দিনের মতো মনে হচ্ছিলো। রতন ভাবছিলো দুর্গা পূজোতেও এত মজা হয় না।

দশটার দিকে ভিনসেন্ট স্যার এলেন ওদের জন্য সত্যজিৎ রায় আর হুমায়ূন আহমেদের দুটো বই নিয়ে। গত কয়েক বছর ধরে তিনি স্কুলের লাইব্রেরির দায়িত্বে আছেন। ভালো করেই জানেন এই ছেলে দুটো কী ধরনের বই পছন্দ করে। রতন আর পিন্টুর বাবা ভিনসেন্ট স্যারকে দেখে দারুণ খুশি। তিনজনে মিলে চা খেতে

খেতে পুরোনো দিনের সুখের সব স্মৃতি খুঁজে বেড়ালেন।

ইরফান, যতীন আর স্বপন বাইরের রেলিং ঘেরা বারান্দায় বসে রাজা উজির মারছিলো। এগারোটার দিকে সূত্রাপুরের ফুটবল টীমের ক্যাপ্টেন লালু এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলো। আগের দিন মা'র কথায় পিন্টু ক্লাবে গিয়ে লালুকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছিলো। স্বপন আর লালু একবয়সী শুধু নয়, একই স্কুলেও নাইন টেন দু' বছর একসঙ্গে পড়েছিলো। এস এস সি পাশ করার পর লালুর বাবা মারা যান। ওর লেখাপড়া আর বেশি এগোয়নি। লালু আসার পর স্বপন বাসা থেকে তাসের প্যাকেট এনে ব্রিজ খেলতে বসলো। পিন্টু আর রতন দুজনই স্বীকার করলো এরকম জমজমাট পিকনিক আগে কখনও হয়নি।

পাঁচ

'আজ কি পূর্ণিমা?'

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর দিয়ে ঘুটঘুট করে পানি কেটে এগিয়ে চলেছে ভোলাগামী তিন তলা বিশাল লঞ্চ কোকো-২। রাত তখন বারোটা। ডেকের যাত্রীরা প্রায় সকলেই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। খোলা নদীতে গভীর রাতে আষাঢ়ের বাতাসও গায়ে কাঁপন ধরায়। দিগন্তজোড়া অবারিত আকাশ আর প্রান্তরে কোনো বাধা না পেয়ে ভেজা বাতাস হু হু করে বইছিলো। নদীর পানিতে সেই বাতাস ছোট ছোট ঢেউয়ের কাঁপন তুলেছে। গলানো রূপোর মতো টলটলে জ্যোৎস্না ঢেউয়ের মাথায় চকচক করছে। রতনের মনে হচ্ছিলো নদীর বুকে হাজার হাজার দেয়ালির আলো জ্বলছে।

বাতাসে পিন্টুর কথা শুনতে পায়নি ও। পিন্টু আবার ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'আজ কি পূর্ণিমা?'

'আজ নয়, গতকাল ছিলো পূর্ণিমা।' সবজান্তার মতো জবাব দিলো রতন।

পিন্টু মুগ্ধ গলায় বললো, 'ঢাকায় কোনোদিন এত সুন্দর জ্যোৎস্না দেখতে পাবি না।'

'সুন্দর খারাপ কোনো জ্যোৎস্নাই আজ পর্যন্ত ঢাকা শহরে দেখিনি।'

'না দেখলে বুঝলি কী করে কাল পূর্ণিমা ছিলো?'

'এটা না বোঝার কী আছে!' পঞ্জিকা ছাড়া ঠাম্মা এক পাও চলতে পারেন না। বাড়ির সবাইকে জানতে হয় কবে অমাবস্যা কবে পূর্ণিমা আর কবে একাদশী।'

নদীর বাঁকে অচেনা গ্রামের ঘাটে কালো কালো নৌকা বাঁধা রয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও এসব নৌকায় জোনাকির মতো মিটমিটে আলো ছিলো। এখন সেখানে শুধু জমাটবাঁধা অন্ধকার। পিন্টু বললো, 'মাঝে মাঝে আমার কী ইচ্ছে করে জানিস?'

'কী ইচ্ছে করে?'

'এরকম লঞ্চে কিংবা ট্রেনে দূরে কোথাও যাওয়ার পথে হঠাৎ যদি একেবারে অচেনা কোনো ছোট্ট ঘাটে বা ষ্টেশনে নেমে পড়ি তাহলে বেশ হয়।'

'ডাকাতের খপ্পরে পড়লে পরনের কাপড় সুদ্ধো খুলে নেবে।'

'তুই একটা কী রে রতন। সারাক্ষণ তোর মাথায় খালি চোর-ডাকাত আর ভূত-পেত্নী গিজ গিজ করছে।'

ভরা জ্যোৎস্নায় খোলা নদীর ভেতর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা রতনের পছন্দ ছিলো না। এ সময় যত অতৃপ্ত আর কুপিত আত্মারা ভর করার জন্য মানুষের শরীর খুঁজে বেড়ায়। নেহাৎ পিন্টুকে সঙ্গ দেয়ার জন্য ও দাঁড়িয়েছিলো। বাড়িতে থাকলে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়তো। পিন্টু এ সময় ভূতের কথা বলাতে রতন খুবই বিরক্ত হলো। গম্ভীর গলায় বললো, 'আমার গুম পাচ্ছে। ঘুবি তো চল।'

'প্লীজ রতন, আর একটু দেখি!'

'ঠাণ্ডা লেগে সর্দি কাশি হলে পরে টের পাবি। এত কী দেখার আছে তাও তো বুঝি না।'

'দেখার চোখ থাকলেই দেখা যায়। তাকিয়ে দেখ, লঞ্চ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাঠ ঘাট সবই বদলে যাচ্ছে। নদী বাঁক নিচ্ছে। এক মিনিট পরে কী দেখবো কিছুই জানি না। আর তুই বলছিস দেখার কিছু নেই?'

'এসব আমি অনেক দেখেছি। এখন শুতে চল। ভোরে উঠে আবার দেখিস।'

'তুই একেবারে বেরসিক।' এই বলে পিন্টু রতনের সঙ্গে শুতে গেলো।

লঞ্চে উঠেই ওরা ডেকের ওপর চাদর বিছিয়ে শোয়ার জায়গা করে নিয়েছে। দুজনের হাত ব্যাগ দুটো রেখেছে মাথার কাছে। অল্প দূরে দুটো আনসার বসে ঝিমোচ্ছে। ওদের পাশে ছিলো গ্রামের দুই বুড়ো। তারাও ততক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে। দূরে একটা ছোট বাচ্চা 'ওঁয়াও' করে কেঁদে উঠে আবার থেমে গেলো। লঞ্চের একঘেঁয়ে শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই।

রতন একটা পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে কুঁকড়ে শুয়েছিলো। পিন্টু মোটা বেড কভার এনেছিলো। বললো, 'ওভাবে শুয়েছিস কেন? আমার চাদরের তলায় আয়।'

রতন কোনো কথা না বলে পিন্টুর কাছে এসে শুলো। ওর ভারি ঘুম পেয়েছিলো। পিন্টু আগে কখনও লঞ্চে ওঠেনি। উত্তেজনায় ওর চোখ ঘুমের লেশমাত্র ছিলো না। একবার ভাবলো রতনের সঙ্গে গল্প করে রাত কাটিয়ে দেবে। নদীর ভেতর ভোরের সূর্য কেমন লাগে দেখতে হবে। রতনের দিকে তাকিয়ে দেখলো ও গভীর ঘুমে ডুবে গেছে। ওর শ্যামলা, রোগা মুখটা বড় অসহায় আর নিস্পাপ মনে হচ্ছে।

পিন্টু জানে ও ছাড়া রতনের আর কোনো বন্ধু নেই। বাড়ির অবস্থা ভালো নয় বলে ক্লাসেও সব সময় আড়ষ্ট থাকে রতন। গায়ে পড়ে কারও সঙ্গে মিশতে যায় না। টিচাররা অবশ্য সবাই ওকে পছন্দ করেন ক্লাসের সবচেয়ে শান্ত ছেলে বলে। একবারই শুধু রতনকে রাগতে দেখেছিলো পিন্টু। তখন ওরা ক্লাস সেভেনে পড়ে। সেবার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কতোগুলো গুণ্ডা হামলা করেছিলো বলে শহরে খুব

উত্তেজনা ছিলো। সেই উত্তেজনার ঢেউ ওদের মিশনারি স্কুলেও এসে পৌঁছেছিলো। ক্লাস টেন–এর সঞ্জয় সূত্রাপুরে থাকে। ছুটির পর রতনকে বলেছিলো 'তুই আমার সঙ্গে বাড়ি যাবি।' রতন রাজী হয় নি। বলেছে, 'না সঞ্জয়দা, আমি পিন্টুর সঙ্গে যাবো।' পিন্টু একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলো। রতনের কথা শুনে সঞ্জয় ওকে টিটকিরি মেরে বলেছে, 'তোর লজ্জা করে না, গরুখোরদের সঙ্গে এরকম মাখামাখি করতে! পিঠে যখন ছুরি মারবে তখন টের পাবি।' সঞ্জয়ের কথা শুনে রতনের চোখ মুখ লাল হয়ে গেলো। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললো, 'খবরদার সঞ্জয়দা, পিন্টুকে নিয়ে একটাও বাজে কথা বলবে না।'

সঞ্জয় কী বলেছিলো পিন্টু শোনেনি। রতনের উত্তেজনা দেখে ও কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো 'কী হয়েছে রে রতন?' কথার জবাব না দিয়ে রতন লাল চোখে সঞ্জয়ের দিয়ে একবার তাকিয়ে পিন্টুর হাত ধরে বললো, 'বাড়ি চল।'

পিন্টু যখন ফুটবল কিংবা ক্রিকেট খেলে রতন তখন ভয় পেয়ে কী রকম সিঁটিয়ে থাকে সে কথা ওর অজানা নয়। একবার ওদের ওপরের ক্লাসের সঙ্গে খেলার সময় রাফ ট্যাকলিং–এ পড়ে পিন্টুর নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিলো। সবাই যখন পিন্টুর নাকে মুখে বরফ ঘষছে, রতন তখন কেঁদে আকুল। পিন্টুকেই উঠে গিয়ে ওর কান্না থামাতে হয়েছে।

পুরোনো সব কথা ভাবতে ভাবতে পিন্টু এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। শেষ রাতে স্বপ্ন দেখলো ও আর রতন ছোট্ট হলুদ পাখি হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ এক বাজপাখির তাড়া খেয়ে দু'জন প্রাণপণে উড়তে লাগলো। পিন্টু অনেক দূর এগিয়ে গেছে, রতন উড়তে পারছে না। পিন্টু ঘুরে এসে তেড়ে গেলো হিংস্র বাজের দিকে। রতন আর্তনাদ করে উঠলো, 'পিন্টু পালিয়ে যা।' ওর কথা পিন্টু শুনলো না। রতন ওর আগে উড়ে এসে বাজপাখিটার ওপর হামলা করলো। ছোট্ট রতনপাখিকে নখে বিঁধিয়ে নিয়ে বাজপাখিটা দ্রুত মেঘের আড়ালে হারিয়ে গেলো। পিন্টু চিৎকার করে কেঁদে উঠলো 'না, রতন না।'

'কী হয়েছে পিন্টু! খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস?' রতনের হাতের ঠেলায় পিন্টু চোখ মেলে তাকালো। রতন আবার বললো, 'ঘুমের ভেতর তুই কাঁদছিলি।'

পিন্টু কোনো কথা না বলে বাইরে তাকালো। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। পুবের আকাশ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। লঞ্চটা দাঁড়িয়েছিলো। পিন্টু জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা এখন কোথায়? লঞ্চ থেমে আছে কেন?'

'জেলেরা মাছ তুলছে লঞ্চে। দেখবি কী রকম চকচকে ইলিশ মাছ!'

পিন্টু উঠে বসলো। ওপরের ডেকের যাত্রীরা সবাই ঘুমে অচেতন। ওরা দু'জন ফার্স্ট ক্লাসের ডেকের দিকে এগিয়ে গেলো। লঞ্চের একেবারে সামনের ফাঁকা ডেকে ফাইবার গ্লাসের কয়েকটা চেয়ার পাতা। রতন আর পিন্টু দুটো চেয়ার টেনে একপাশে বসলো।

নিচে বড় নৌকা থেকে জেলেরা লঞ্চে মাছ তুলে দিচ্ছে। নৌকার খোলের

ভেতর বরফকুচির ভেতর রূপোলি ইলিশের ছড়াছড়ি। নদীর ওপর কুয়াশার চাদর বিছানো। নদীর কুল কিনারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পিন্টু জিজ্ঞেস করলো, 'এ নদীর নাম কী?'

'এখনও আমরা মেঘনার ওপর আছি। কিছুক্ষণ পর তেতুলিয়া নদীতে গিয়ে ঢুকবো।'

মাছ তোলা নিয়ে জেলেদের হইহল্লা বোধহয় লঞ্চের সারেং-এর পছন্দ হচ্ছিলো না। বেশ কয়েকবার ভেঁপু বাজালো। ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজালো। জেলেরা তড়িঘড়ি মাছের বড় বড় বাঁশের চাঙারি লঞ্চে তুলে দিয়ে নৌকা নিয়ে দূরে সরে গেলো। লঞ্চ আবার ঘুট ঘুট ঘুট শব্দ করে মেঘনার মোহনার দিকে এগিয়ে চললো।

পুব আকাশের ফিকে সাদা রঙটা ধীরে ধীরে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। দিনের প্রথম সূর্য ওদের মুখে আলোর আবির মাখিয়ে দিলো। ভোরের আলো মাখা ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস আদর করে ওদের চুল এলোমেলো করে দিলো। আর তখনই দুটো হলুদ পাখি হয়ে সূর্যের দিকে উড়ে যেতে ইচ্ছে হলো পিন্টুর।

কিছুক্ষণ পর লুঙ্গি পরা ছোট্ট একটা ছেলে এসে বললো, 'স্যার চা লাগবো?'

পিন্টু বললো, 'দু কাপ চা আর বিস্কিট দাও।'

একটু পরে চা ওয়ালা দু' কাপ চা আর চারটা নোনতা বিস্কুট আনলো। রতন ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'পানি আনতে পারবে?'

'ক্যান পারুম না?' বলে দু' গ্লাস পানি দিয়ে গেলো ছেলেটা।

ফার্স্ট ক্লাসের কেবিনগুলোর শেষ মাথায় আয়না বসানো বড় বেসিনে গিয়ে রতন আর পিন্টু মুখ ধুয়ে এলো। তারপর চা খেতে খেতে ওরা মেঘনার মোহনায় টকটকে লাল সূর্যকে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে দেখলো। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের তখনও ঘুম ভাঙেনি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর রতন পিন্টুকে জিজ্ঞেস করলো, 'শেষ রাতে কী স্বপ্ন দেখছিলি পিন্টু? তোর ফোঁপানো দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিলো।'

স্বপ্নের কথা বলতে পিন্টু লজ্জা পাচ্ছিলো। তবু আস্তে আস্তে রতনকে ওর দেখা পুরো স্বপ্নটার কথা বললো।

ডেকের রেলিং-এর ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো পিন্টু। ওর হাতের ওপর হাত রেখে রতন মৃদু হেসে বললো, 'তুই থাকতে বাজপাখি কেন, কোনো কিছুই ভয় পাই না আমি।'

মৃদু হেসে পিন্টু বললো, 'আমি জানি।'

লঞ্চের মুখ ধীরে ধীরে ডান দিকে ঘুরে গেলো। নদীর দুই তীরের ঘরবাড়ি গাছপালা কাছে চলে এলো। মেঘনার বিশালতার কাছে তেতুলিয়া নদীকে মনে হয় খালের মতো। কুয়াশার ফিনফিনে চাদর বিছানো মাঠে চাষীরা লাঙল দিচ্ছে; জেলেরা তিনকোণা ধর্মজাল দিয়ে পানি থেকে মাছ ছেঁকে তুলছে। পানির ওপরে

জাল তোলার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট রুপোলি মাছগুলো ঝলমল করে উঠছে। রতন বললো, 'চল, আমাদের জায়গায় যাই। লোকজন না আবার বিছানা মাড়িয়ে দেয়।'

এত সুন্দর জায়গা থেকে পিন্টুর যেতে ইচ্ছে করছিলো না। তবু রতনের কথায় যেতে হলো। ডেকে যারা শুয়েছিলো তাদের অনেকে উঠে বসেছে। কেউ ব্যাগ গোছাচ্ছে। কেউ চা খাচ্ছে। রতন বললো, আর আধাঘন্টার ভেতর আমরা ভোলা পৌছে যাবো।'

পিন্টুর মনে হলো, ভোলা যদি আরও দূরে হতো, যেতে যদি আরও দু' তিন দিন লাগতো তাহলে মন্দ হতো না। মানুষ যা ভাবে সব সময় তা কি হয়!

রতন বললো, 'কি রে, বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে?'

'ধ্যাৎ! কচি খোকা নাকি বাড়ির জন্য মন খারাপ করবে! ভাবছিলাম লঞ্চ জার্নিটা আরও লম্বা হলেই পারতো।'

রতন হেসে বললো, 'বেশি লম্বা নয় বলেই ভালো লাগছে। দু' তিন দিন এরকম পানিতে থাকলে ডাঙায় উঠার জন্য ছটফট করতি।'

ভোলার দিদির বাড়িতে আগেও দু'বার এসেছে রতন। ঘাট থেকে রিকশা নিয়ে উকিল পাড়া আসতে ওদের মিনিট কুড়ির মতো সময় লাগলো। রতনের জামাইবাবু শেখরদা বাড়িতেই ছিলো। রিকশা এসে কাঠের দোতালা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই বড়দির সাত আট বছরের ফুটফুটে মেয়ে ভেতর থেকে ছুটে এলো। রতনকে দেখে 'ছোট মামা আসছে, ছোট মামা আসছে,' বলে আবার ছুটে গেলো বাড়ির ভেতরে। পিন্টু রিকশার ভাড়া না মেটাতেই দিদি আর জামাই বাবু বেরিয়ে এলো। পিন্টুকে রিকশার ভাড়া দিতে দেখে হা হা করে উঠলো জামাই বাবু—এইটা কি কর পিন্টু বাবু, তুমি অতিথ মানুষ, রিকশার ভাড়া তুমি ক্যান দিবা!' বলে রিকশাঅলাকে ধমক দেয়ার ভান করলো—'তোর সাহস তো কম না রমিজউদ্দিন, আমার অতিথের কাছ থেইকা ভাড়া লস!'

রিকশাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে দশটাকার নোটটা পিন্টুর হাতে গুঁজে দিয়ে লজ্জায় জিভ কেটে বললো, 'আমি ক্যামনে জানুম উকিল বাবু ওনারা আমনেগো অতিথ!' জামাইবাবুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিকশা নিয়ে সে হনহন করে চলে গেলো।

পিন্টু বললো, 'এটা ঠিক হলো না শেখরদা। ওকে তো সারাদিনই কারও না কারও মেহমনকে বইতে হবে।'

'ও আমার কাছ থেইকা ভাড়া নিবো। তুমি ক্যান দিবা? শহরে আমার একটা মান সম্মান আছে না! না কি গো শালাবাবু।' শেষের কথাটা বলা হলো রতনকে।

রতন কিছু বলার আগে ওর বড়দি বললো, 'আগে ঘরে চলো তো পিন্টু! তোমাদের শেখরদার পাল্লায় পড়লে সারাদিন কথা শুনতে হবে!'

শেখরদা হেসে বললো, 'গিন্নি কথা বেইচা সংসার চলে। কথারে এত ঘিন্না কর ক্যান!'

'তোমার কথা কোর্টে গিয়া সরকারী উকিলরে শুনাইও।' বলতে বলতে বড়দি সবাইকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

রতনের বড়দির বড় ছেলে শান্ত বাড়িতে ছিলো না। রতনের চেয়ে মাত্র ছ মাসের ছোট, লালমোহনে ওর পিসির বাড়ি গেছে বিয়ে খেতে! রতন জিজ্ঞেস করলো, 'শান্ত কবে আইবো বড়দি?'

'বিয়া ওইবো আইজ। কাইল আইয়া পড়বো। তোরা আইবি হুইনা কি যাইবার চায়? আইজ অর বাপের মামলার তারিখ, যাইবার পারবো না বইলা জোর কইরা পাঠাইছি।'

শান্তকে রতনদের বাড়িতে আগে দেখেছে পিন্টু। ভেবেছিলো ও থাকলে ঘুরে বেড়ানোর সুবিধে হবে। ভাগ্যিস্য কালই এসে পড়বে। নইলে ঘরে বসে পিন্টুর সঙ্গে লুডু নয় ক্যারাম খেলতে হতো।

শেখরদা কোর্টে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। আজ নাকি ওর সাংঘাতিক এক খুনের মামলার শুনানি হবে। রতনকে বললো, 'চান টান কইরা ইচ্ছা করলে তোমার বন্ধুরে শহরটা গুরায়া দেখাইতে পার। দ্যাখনের যদিও কছুই নাই।'

বড়দি বললো, 'আইজ গুরাগুরির কাম নাই। এতদূর থেইকা আইছে। আইজ রেস্ট লয়া কাইল শান্তরে নিয়া গুরতে পারবো।'

পিন্টুর অবশ্য ঘুরতে যেতে আপত্তি ছিলো না, তবে রতন বললো, 'হ শেখরদা, আইজ আর বাইর ওমু না।'

পিন্টু আর রতনের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে দোতালায় শান্তর পাশের ঘরে। এ ঘরটা অতিথি-কুটুম্বদের জন্য রাখা হয়েছে। দোতালায় ঘর দুটোই, তিনদিকে ঘেরা বারান্দা। ঘরের মেঝে, দেয়াল সবই কাঠের, ওপরে শুধু টিন। তবে টিনের তলায় কাঠের সিলিং রয়েছে। ঘরের একপাশে পুরোনো দিনের বনেদি প্যাটার্নের একটা বড় খাট, পাশে কাঠের আলমারি, অন্য দিকের দেয়ালে পড়ার টেবিলের মতো উঁচু সেকেলে ড্রেসিং টেবিল। দুটো কাঠের চেয়ার রয়েছে টেবিলটার পাশে। দেয়ালে রামকৃষ্ণ আর সারদা মায়ের ছবিওয়ালা একটা বাংলা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। ছবিতে দু'জনের মাথা থেকে জ্যোতি বেরুচ্ছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ওরা শান্তর ঘরে ঢুকলো। ওর পড়ার টেবিলের পাশে ছোট একটা বুক শেলফ ভর্তি গল্পের বই। বেশির ভাগই সেবা প্রকাশনীর পেপার ব্যাক। ওখান থেকে দুটো ওয়েস্টার্ন কাহিনীর বই নিয়ে ওরা সন্ধ্যে পর্যন্ত নিজেদের ঘরে কাটিয়ে দিলো। বড়দির ছোট মেয়ে চুমকি যখন ওদের চা খেতে ডাকতে এলো তখনও ওদের বই শেষ হয়নি।

নিচে বসার ঘরে চা নিয়ে বড়দি অপেক্ষা করছিলো। শেখরদা কোর্ট থেকে ফিরে কাপড় বদলাতে গেছে। চায়ের সঙ্গে নাশতার বহর দেখে পিন্টু আঁতকে উঠলো। দুপুরে তিন রকমের মাছ আর চার পাঁচ রকমের ভাজি, নিরামিষ, ছেচকি খেয়ে পেটে তিল ধারণের জায়গা নেই। এখন আবার বড়দি লুচি, আলুর দম,

ভাজি আর সুজির মোহনভোগ তৈরী করেছে। পিন্টু কাতর গলায় বললো, 'দুপুরে এত কিছু খেয়েছি এরপর এসব খেতে হলে দম আটকে মরে যাবো বড়দি।'

'বালাই ষাট। এ আবার কেমন কথা। কোন দুপুরে খেয়েছো, এখন প্রায় ছটা বাজে। খেয়ে না হয় নদীর ধার থেকে ঘুরে এসো। সব হজম হয়ে যাবে।'

বড়দিকে খুশি করার জন্য গোটা চারেক লুচি পিন্টুকে খেতেই হলো। রতন দুটোর বেশি খেলো না। বড়দি বললো, 'না খাইয়া তো দিন দিন চামচিকা হইতাছস। দ্যাখছস পিন্টুর কী সোন্দর স্বাস্থ্য?'

তর্ক করে লাভ নেই জেনে রতন নিরবে হাসলো। পিন্টু চা খাওয়া শেষ করে রতনকে বললো, 'চল, একটু হেঁটে আসি। খাওয়ার যা বহর দেখছি, সাতদিন থাকলে সাত কেজি ওজন বাড়বে।'

রতন হেসে বললো, 'তোর বাড়তে পারে, আমার বাড়বে না।'

হাঁটতে হাঁটতে পিন্টু আর রতন কলেজের দিকে গেলো। খুবই ছোট শহর ভোলা। পিন্টুদের যশোরের চার ভাগের এক ভাগও হবে না। রাস্তায় একটা গাড়িও দেখতে পেলো না ওরা। শুধু রিকশা আর সাইকেল। রতন বললো, 'শহরের ভেতর বাস সার্ভিস নেই।'

ভোলা কলেজের সামনে বিরাট মাঠ। তারপর ধান ক্ষেত। দুপুরের দিকে বেশ গরম পড়েছিলো। এখন চমৎকার বাতাস বইছে। পিন্টু আর রতন মাঠে বসে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ। পিন্টু বললো, 'কী রকম তাজা বাতাস দেখেছিস? কোনো ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, ইচ্ছে করছে এখানেই থেকে যাই।'

'দুদিন পর যখন দেখবি এখানে কালার টেলিভিশন নেই, ভিসিআর নেই, ফুটবল লীগের খেলা নেই, তখন ঠিকই ঢাকা যাওয়ার জন্য ছটফট করবি।'

আটটার দিকে বাড়ি ফিরে পিন্টু দেখলো বসার ঘরে অচেনা এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বসে আছেন। ভদ্রমহিলা বয়সে বড়দির অনেক বড় হবেন, পরনে লালপাড় গরদের শাড়ি। কপালে বড় সিদুরের টিপ। রতন পিন্টুর কানে কানে বললো, শেখরদার বড় ভাই রণেনদা আর বৌদি কুঞ্জের হাটে থাকে।'

পিন্টু ঘরে ঢুকতেই শেখরদা ওর দাদা বৌদির সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিলো। রতন ওদের নমস্কার দিলো। পিন্টু হাত তুলে বললো, 'আদাব।'

রণেনদা হেসে বললেন, 'এসেছিলাম আমার বড় মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। রতন, তোমরা তো আসবেই, পিন্টুকেও সঙ্গে এনো। আসবে তো পিন্টু?'

পিন্টু অবাক হয়ে বললো, 'কবে বিয়ে, কোথায়?

'হাতে অনেক সময় আছে। ডিসেম্বরের বারো তারিখে বিয়ে। ছেলের বাড়ি চরফ্যাশন। বিয়ে এখানেই হবে।'

পিন্টু মৃদু হেসে রতনকে জিজ্ঞেস করলো, 'কী রে আসবি?'

শেখরদা বললো, 'আসবে না কেন? আমি সবার জন্য টিকেট পাঠিয়ে দেবো। আমাদের পরের জেনারেশনের প্রথম বিয়ে এটা। কলকাতা থেকে বাজি আনাবো।'

ঃ তুই থাকতে বাজপাখি কেন, কোনো কিছুই ভয় পাই না··

শেখরদার বৌদিও বললেন, 'এসো কিন্তু ভাই। তোমার বাবা মাকেও নেমন্তন্ন করবো। শান্তর মা'র কাছে তোমাদের বাড়ির কথা অনেক শুনেছি।'

পিন্টু লজ্জা পেলো—'ঠিক আছে, আসবো।' বলে ওপরে গিয়ে রতনকে বললো, 'জানা নেই, শোনা নেই, শেখরদার ভাই কিভাবে নেমন্তন্ন করে ফেললেন দেখলি? আমিও বলে দিলাম আসবো।'

রতন বললো, 'জানা নেই মানে আগে দেখিস নি। বৌদি কী বললেন শুনলি না? বড়দির কাছে তোদের বাড়ির কথা অনেক শুনেছেন।'

'তুই আসবি?'

'আসা যাবে। তখন তো স্কুল ছুটি থাকবে।' একটু হেসে রতন এর সঙ্গে যোগ করলো—'তাছাড়া টিকেট পাঠাচ্ছে শেখরদা।'

পরদিন দুপুরের আগেই শান্ত এলো। পিন্টুকে দেখে উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, 'পিন্টু মামা, তুমি আসছো জেনে কী যে খুশি হয়েছি। আমাদের পাড়ার ক্লাবের একটা ফুটবল টীম আছে। ওরা তোমার খেলা দেখবে বলেছে।'

রতন হেসে বললো, 'পিন্টু এখন টাকা ছাড়া বাইরে খেলে না।'

শান্ত বললো, 'টাকা না, আমরা পিন্টু মামাকে সংবর্ধনা দেবো। আমাকে বলেছে মানপত্র লিখে দিতে।'

পরদিন থেকে শান্তদের ক্লাবে খেলা, ছেলেদের কোচিং করা, কলেজ রোডের এক টুর্নামেন্টে পুরস্কার বিতরণ, শেখরদার ভাই বোনদের বাসার নেমন্তন্ন খাওয়া আর সবাই মিলে নৌকায় নদীতে ঘোরার ভেতর দিয়ে ভোলার দিনগুলো কিভাবে কেটে গেলো ওরা টেরই পেলো না।

দ্বিতীয় পর্ব

ছয়

পিন্টু আর রতনদের বছর শেষের পরীক্ষা নভেম্বরেই শেষ হয়ে গেছে। ডিসেম্বরের দুই তারিখে ফলও বেরিয়ে গেলো। রতন এবার থার্ড হয়েছে। গত পরীক্ষায় রতন সিক্সথ হয়েছিলো। সেবার ওতেই সবাই খুশিতে ওকে উপহার দিয়ে পিকনিক-টিকনিক করে একাকার করে ফেলেছিলো। অবশ্য পিন্টুও সেই আনন্দের সমান অংশীদার ছিলো। রতন ঠিক করেছিলো এ্যানুয়াল পরীক্ষায় আরও ভালো করবে। কোচিং ক্লাসে যাওয়ার সামর্থ ওর নেই। বাড়িতেই মেজদার কাছে পড়েছে। স্বপনের এখনও চাকরি হয়নি। কত জায়গায় দরখাস্ত দিয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। ফিজিক্স—এ মাস্টার্স করে কলেজের মাস্টারির চাকরি দূরে থাক ব্যাংকের কেরানীর চাকরীও পায়নি। কেরানীগঞ্জে এক স্কুলে একবার দরখাস্ত করেছিলো। সার্টিফিকেট আর রেজাল্ট দেখে স্কুল কমিটির সেক্রেটারি ওকে নিতে রাজি হয়নি। বলেছে, 'এখন দায়ে পড়ে এখানে চাকরি করবেন, দুদিন পর ভালো অফার পেলে চলে যাবেন। আমাদের বি এস সি হলেই চলবে। এত কোয়ালিফিকেশন আমাদের দরকার নেই।'

এ্যানুয়াল পরীক্ষায় পিন্টু ফোর্থ-এর ওপরে উঠতে পারেনি। এতে অবশ্য ও অখুশি নয়। নিচে যে নামেনি এই ঢের। পড়ার পেছনে ও রতনের মত সময় দিতে পারেনি। গত চার মাসে ও সূত্রাপুর বয়েজ ক্লাবের হয়ে পাঁচটা ম্যাচ খেলেছে। সেক্রেটারি হাশমতউল্লা দু'দিন ওর বাড়িতে এসেছিলো। একদিন ওর বাবার সঙ্গেও কথা বলেছে। বাবার এক কথা, —'এমনি মাঝে মধ্যে এক আধটা ম্যাচ খেলে সেটা এক কথা, আর ক্লাবের রেগুলার প্লেয়ার হিসেবে খেলা অন্য কথা। বি এ পাশ করার আগে ওসব হবে টবে না।'

ডিসেম্বরের এগারো তারিখে সূত্রাপুরের সঙ্গে মুসলিম ইন্সটিটিউটের খেলার কথা। পিন্টু মানা করে দিয়েছে। দশ তারিখে ও, রতন আর স্বপন ভোলা যাবে। শেখরদা লিখেছে পাঁচ ছয় তারিখের মধ্যে টিকেট পাঠিয়ে দেবে। বিয়ের নেমন্তন্নের কার্ডও এসে গেছে ডাকে।

পিন্টু ঠিক করেছে এবার গিয়ে দিন পনেরো থাকবে। গতবার জুলাই মাসের

গরমেও এত মজা হয়েছে যে বলার নয়। শান্ত ওকে আলাদা করে চিঠি লিখেছে—'পিন্টু মামা, তুমি আসবে শুনে চরমাণিক থেকে আমার এক বন্ধু খবর পাঠিয়েছে তোমাকে নিয়ে অবশ্যই যেন ওদের বাড়িতে বেড়াতে যাই। জায়গাটা বঙ্গোপসাগরের খুবই কাছে। ওদের বাড়ি থেকে সুমদ্রের গর্জন শোনা যায়। তুমি একই সঙ্গে সমুদ্রের ভেতর সূর্য ওঠা আর সূর্য ডোবা দেখতে পাবে।' চিঠির শেষে দেড় বিঘত বড় সমুদ্রের চিংড়ি খাওয়াবারও লোভও দেখিয়েছে শান্ত।

পাঁচ তারিখ সকালে লঞ্চ কোম্পানির এক লোক এসে রতনদের বাসায় ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের তিনটা টিকেট দিয়ে গেলো। একটা টিকেট ছিলো সিঙ্গেল কেবিনের আর দুটো আলাদা কেবিনের। সিঙ্গেলটা স্বপন নিয়েছে।

পিন্টুকে খবরটা দিতে এসে রতন উচ্ছ্বসিত গলায় বললো, 'ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে রাজার হালে যাবো। প্রত্যেক কেবিনে কালার টিভি, রুম সার্ভিস—দারুণ মজা হবে।'

পিন্টু নিজেও ভাবেনি শেখরদা ওদের জন্য একেবারে ডিলাক্স কেবিনের টিকেট পাঠাবে। জিজ্ঞেস করলো, 'স্বপনদা যাচ্ছে?'

'প্রথমে একটু গাইগুই করছিলো। টিকেট পেয়ে নিজেকে এখন ভি আই পি ভাবছে।'

'হ্যাঁরে, তোর গরম কাপড় চোপড় আছে তো? সেবার জুলাই মাসে নদীতে কেমন ঠাণ্ডা পড়ে ছিলো টের পাসনি?'

রতন হেসে বললো, 'পুরোনো সুয়েটার যেটা আছে ওতেই হয়ে যাবে। কেবিনের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবো, শীত আসবে কোত্থেকে?'

'তুই কেবিনে বসে থাকবি আর আমি রাতে একা একা ডেকে বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবো?'

তোর মতো সুয়েটার আর দামী শাল আলোয়ানওয়ালা অনেক প্যাসেঞ্জার পাবি। ফার্স্ট ক্লাসের ডেক বলে কথা!'

'চল ঘুরে অসি।'

'কোথায়?'

'বঙ্গবাজারে। আমি একটা জ্যাকেট কিনবো, তুইও কিনবি।' 'গার্মেন্টস ওয়ালাদের সুন্দর সুন্দর জ্যাকেট পাওয়া যায় ওখানে।'

'সে তো অনেক দাম!'

'কে বলেছে অনেক দাম! তুই চল না আগে।'

'টাকা কোথায় পাবি?'

'কেন, এতগুলো ম্যাচ খেলার টাকা কম জমেছে?'

'রতন জানে গত পাঁচ ম্যাচে পিন্টু ছাব্বিশ শ টাকা পেয়েছে। কথা না বাড়িয়ে রিকশায় চেপে বঙ্গবাজারে গিয়ে দুটো কড-এর জ্যাকেট আর প্যান্ট কিনলো। একটা জ্যাকেট নীল, আরেকটা হালকা বাদামি। দুটোরই ভেতরে উলের লাইনং

দেয়া। মাপ দেখার জন্য দোকানি যখন রতনকে নীল জ্যাকেকটটা পরালো তখন ও পিন্টুকে বললো, 'এটা গায়ে দিলে আমাকে আর চেনা যাবে না।'

পিন্টু বললো, 'তোকে ঠিক প্রিন্স অব কাগজিটোলা মনে হচ্ছে।'

দু' বন্ধু একসঙ্গে গলা খুলে হাসলো।

পরদিন বিকেলে রতনদের বাড়িতে মানিকগঞ্জ থেকে কন্যাপক্ষ এলো যতীনের বিয়ের তারিখ পাকা করতে। কনে দেখা আগেই হয়ে গেছে। রতন বাড়ির কাজে ব্যস্ত ছিলো। পিন্টু সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে গিয়ে দেখলো দারুণ উত্তেজনা সেখানে। সকালে টেলিভিশনে সিএনএন—এর খবরে দেখিয়েছে ভারতের অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ নাকি একেবারে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে করসেবক আর বিজেপির লোকজনরা। বাবরী মসজিদ নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকায় তিন চারদিন ধরে খবর বেরোচ্ছিলো ওটা নাকি ভাঙার পায়তারা চলছে। নাকি ওটা আগে রাম মন্দির ছিলো। পিন্টু খবরের কাগজে একমাত্র খেলার পাতাটাই পড়ে, সিএনএনও দেখে না। বাবরী মসজিদের খবর ক্লাবে ও প্রথম শুনলো।

ক্লাবের ভেতর সবচেয়ে বেশি চ্যাঁচাচ্ছিলো চিকা হাশমতউল্লা। হাত পা নেড়ে থু থু ছিটিয়ে ও বক্তৃতার ঢং-এ বলছিলো, 'মালাউনগো এইবার উচিৎ সিক্ষা দেওন লাগবো। কত বড় সাহস দ্যাখ, বাবরী মসজিদ বাইঙ্গা ফালাইছে?'

সাদা দাড়িওয়ালা আরেকজন বললো, 'মালাউনগো সিক্ষা দিতে ওইলে অগো মন্দিরগুলা আগে বাইঙ্গা ফালান লাগবো। অহন ঠিক কর কোই থেইকা শুরু করবা।'

'বাংলাদ্যাশে মালাউনগো জাগা নাই।'

লালু চুপচাপ বসেছিলো। ওর টীমে হিন্দু প্লেয়ার আছে দু'জন। একজন মিডফিল্ডে, আরেকজন লেফট উইং-এ দারুণ খেলে। হাশমতউল্লার কথা শুনে ও একটু রেগে গিয়ে বললো, 'বাবরী মসজিদ যারা ভাঙ্গছে, হ্যাগরে গিয়া সিক্ষা দ্যান। এইহানকার হিন্দুরা কারে কী করছে?'

হাশমতউল্লা ওকে ধমক দিয়ে বললো, 'আরে লাউলা চুপ মাইরা বয়া থাক। হিন্দুগো দালালি যারা করবো হ্যাগরে সিদা ইণ্ডিয়া পাঠাইয়া দিমু কইলাম। আইজ থেইকা আমগো কেলাবে কুন হালায় হিন্দু ঢুকবার পারবো না।'

লালু রেগে উঠে দাঁড়ালো—'খেলার ভিতরে কিয়ের হিন্দু মোসলমান? আপনে কী কইবার চান? অজিত আর গৌরাঙ্গরে বাদ দিয়া আমি টীম করবার পারুম?'

'তুই না পারস আমি পারুম। খেলার মাঠেও মোসলমানগো ইমানের পরীক্ষা দেঅন লাগবো।'

সাদা দাড়িওয়ালা নিজের দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললো, 'আইজ কাইলকার পোলাপান ক্যামনে জানবো! মোহামেডান কেলাব না থাকলে পাকিস্তান পয়দা ওইতো না।'

'আপনের পাকিস্তানের মুখে আমি মুতি।' রাগী গলায় লালু বললো, 'আমার

টীমে কেউ হাত দিবার পারবো না।'

হাশমতউল্লা চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি কেলাবের সেক্রেটারি। টীম ঠিক করুম আমি। আমার হুকুম অই মালাউন দুইটা আর কেলাবে ঢুকবার পারবো না।'

'থাকেন আপনের কেলাব লয়া। আমারে আর পাইবেন না।' এই বলে লালু ঝড়ের বেগে ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেলো।

অভিজ্ঞ গোলকিপার লালুকে প্রথম দিনই পিন্টুর ভালো লেগেছিলো ওর খেলার জন্য। আজ ভালো লাগলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ওর প্রতিবাদ করার সৎ সাহস দেখে। লালুর পেছন পেছন পিন্টুও ক্লাব থেকে বেরিয়ে এলো।

কয়েক পা দৌড়ে এসে ও লালুকে ধরে ফেললো। বললো, 'লালু ভাই দাড়ান, আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

লালু ঘুরে দাঁড়ালো পিন্টুর দিকে। ওর চোখে চোখ রেখে বললো, 'তুই এই রাজাকারের বাচ্চাগো টীমে খেলবি পিন্টু?' রাগে দুঃখে ওর গলা রীতিমতো কাঁপছিলো।

পিন্টু শান্ত গলায় বললো, 'যারা এরকম নোংরা কথা বলতে পারে তাদের টীমে খেলার প্রশ্নই ওঠে না।'

পিন্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরে লালু বললো, 'তুই খাঁটি স্পোর্টসম্যানের মত কথা কইছস পিন্টু।'

বিকেলে ক্লাবে আসার পর থেকে লালু সেক্রেটারি হাশমতউল্লা আর ভাইস প্রেসিডেন্ট চোরা ফখরুর তড়পানি দেখতে দেখতে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলো। কবে কার ছাগল চুরি করে ধরা পড়েছিলো বলে সাদা দাড়িওয়ালা ফখরুদ্দিনের নাম হয়ে গেছে চোরা ফখরু। শয়তানটা বলে কিনা,—'অরা একটা মসজিদ ভাঙ্গছে, আমরা এক হাজারটা মন্দির ভাইঙ্গা পেরতিসোধ লমু।' শুনে রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠেছিলো লালুর। ইচ্ছে করছিলো ওর শোলার মত নরম নড়বড়ে গলাটা এক টিপে ভেঙে ফেলে। অন্য প্লেয়াররাও সেক্রেটারির ভয়ে টু শব্দটি উচ্চারণ করেনি। এতক্ষণ পর পিন্টুর কথা শুনে ও কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

ওরা যাচ্ছিলো ফরাশগঞ্জের দিকে। লালুর বাসা তাঁতীবাজার। হঠাৎ দূরে অস্পষ্ট শ্লোগানের শব্দ শুনে পিন্টু আর লালু দু'জনই থমকে দাঁড়ালো। একটু পরে আবার শুনলো সেই শ্লোগান, এবার বেশ স্পষ্ট—'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর।'

লালু চাপা গলায় পিন্টুকে বললো, 'যা ভাবছিলাম তাই ওইছে। তগো পাড়ায় হিন্দু বাড়ি কয়টা পিন্টু?'

হিসেব করে পিন্টু বললো, 'পাঁচটা। কেন লালু ভাই?'

'আইজ রাইতে এ্যাটাক ওইবার পারে। নাইলে কাইল ওইবো। মনে ওইতাছে রায়ট লাইগা যাইবো।'

'রায়ট' শব্দটা শুনে পিন্টুর বুকের ভেতর ধক করে উঠলো। হিন্দু মুসলমানদের

ভয়ঙ্কর রায়টের কথা ওর বাবা আর রতনের বাবাকে বলতে শুনেছে। বছর দুয়েক আগেও সূত্রাপুরে কয়েকটা হিন্দুর দোকান লুট হয়েছে। লালু বললো, 'রাইত ওইয়া গ্যাছে পিন্টু। বাড়িত যা। জোয়ান পোলাপাইন যা আছে সবতেরে লইয়া পাড়ায় গার্ড দে। কোন মতেই রায়ট লাগবার দিবি না। একবার লাইগা গেলে থামান যাইবো না।'

সবার আগে রতনের কথা মনে হলো পিন্টুর। 'অমি যাই লালু ভাই,' বলেই ও উল্টোদিকে দৌড় দিলো।

পিন্টুদের বসার ঘরে চুপচাপ বসেছিলেন ওর বাবা আর রতনের বাবা। দাবা খেলার কথা ওরা ভুলে গেছেন। পিন্টুর বাবা অফিসেই শুনেছেন বাবরী মসজিদ ভাঙার সংবাদ। রতনের বাবা সেদিন সরকারদের গদিতে যাননি বাড়িতে যতীনের বিয়ের তারিখ পাকা করার জন্য কন্যাপক্ষ আসবে বলে। সন্ধ্যার পর অতিথিদের বিদায় দিয়ে দাবা খেলতে এসে পিন্টুর বাবার কাছে শুনলেন এই দুঃসংবাদ। অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকার পর আস্তে আস্তে বললেন, 'এরকম একটা কিছু হবে--কদিন ধরেই ভয় হচ্ছিলো।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, 'শহরের অবস্থা কেমন দেখলেন? অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে?'

'পুরানা পল্টন থেকে শুরু করে ডালপট্টি পর্যন্ত হিন্দুদের যেসব দোকানপাট আছে সব দুপুরের পরই বন্ধ হয়ে গেছে। শহরে বেশ থমথমে ভাব।'

'কোনো মিটিং মিছিল চোখ পড়েছে?'

'না, অফিস থেকে আসার সময় তেমন কিছু আমার চোখে পড়েনি। কাল দৈনিক পত্রিকায় খবরটা বের হলে মনে হয় গণ্ডগোল লাগবে।'

'এসব আর ভালো লাগে না।' আক্ষেপের গলায় রতনের বাবা বললেন, 'আর কতদিন আমাদের এরকম ভয়ের ভেতর দিন কাটাতে হবে?'

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পিন্টুর বাবারও জানা নেই। তবু বললেন, 'পাড়ায় আমরা প্রতিরোধ কমিটি করবো। ছেলেরা রাত জেগে পাহারা দেবে।'

রতনের বাবা বিড়বিড় করে বললেন, 'সমস্যা কি এতে দূর হবে?'

'তপতী আর কেতকীকে আমাদের বাসায় পাঠিয়ে দিন। রতনও এসে পিন্টুর সঙ্গে থাকুক।'

'রাতে না হয় আগলে রাখলেন ওদের। দিনে কি ওরা ঘর থেকে বেরোবে না? স্কুল কলেজ করবে না?'

'এখন তো সব বন্ধ! আর দুদিন পরই ওরা ভোলা যাচ্ছে। ঢাকায় গণ্ডগোল বেশি হলে তপতীরা ভোলা চলে যাক। এসব গণ্ডগোল বড় শহরেই হয়। ভোলা পর্যন্ত যাবে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতনের বাবা উঠে দাঁড়ালেন — 'তাই করতে হবে। ভয় বেশি দুই মেয়েকে নিয়ে।' এই বলে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন।

পিন্টুর বাবা পেছন থেকে তাঁকে ডাকলেন — 'দাদা একটু দাঁড়ান।'

রতনের বাবা ঘুরে দাঁড়ালেন। পাশে ভাঁজ করে রাখা শালটা গায়ে জড়িয়ে পিন্টুর বাবা বললেন, 'চলুন, সরকার বাবু আর হেমাঙ্গ বাবুদের বাড়ি গিয়ে দেখে আসি ওঁরা কেমন আছেন।'

রতনের বাবা বললেন, 'গতবার ওঁরা চৌধুরি ভিলায় ছিলেন।'

পাড়ার সবচেয়ে সুরক্ষিত বাড়ি নগেন্দ্র চৌধুরীদের উঁচু পাচিল ঘেরা চৌধুরী ভিলা। ভারি লোহার গেট পাহারা দেয় দুজন বন্দুকধারী দারোয়ান, গতবার যখন রায়ট লাগার উপক্রম হয়েছিলো তখন ছয়জন পুলিশ এ বাড়ি পাহারা দিয়েছে। এককালে মস্ত জমিদার ছিলেন চৌধুরীরা। জমিজমা এখনও অনেক আছে। তাছাড়া নিজেদের লঞ্চ কোম্পানি আছে, ব্রিকফিল্ড আছে, দুটো জুয়েলারি শপও আছে। তাঁদের ভয়ের কোনো কারণ নেই।

ওঁরা দুজন রাস্তায় নামতেই দেখলেন পিন্টু আর রতনকে, হন হন করে তাঁদের দিকেই আসছে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে পিন্টু বললো, 'বাবা, আমরা আজ রাতেই পাড়ায় প্রতিরোধ কমিটি করবো। ইরফান ভাই আমাদের বাসায় মিটিঙ ডেকেছেন।'

পিন্টুর বাবা বললেন, 'মিটিঙ করছো ভালো কথা। রতনকে সঙ্গে নিয়ে এভাবে ঘুরবে না।'

রতন বললো, 'আমি পিন্টুর সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কি কাকাবাবু?'

'ক্ষতি আছে বাবা। আমাদের পাড়ার সবাইকে ফেরেশতা ভাববার কারণ নেই। তোমাদের পাশের বাড়িতে থাকে মুসলিম লীগের আব্বাস আলী। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে তোমাদের বাড়ি লুট করেছিলো। শয়তানটা এখন জামাতী হয়েছে। তোমাদেরকে এসব কমিটিতে দেখলে লোক ক্ষেপানোর সুযোগ পাবে।'

'ঠিক আছে রতন। তুই আমার ঘরে গিয়ে বোস। আমি বাকি সবাইকে বলে এখনই আসছি।' এই বলে পিন্টু ওদের সামনের বাড়ির আশরাফকে খবর দিতে গেলো।

রতন আর পিন্টুর বাবা সরকারদের বাড়ি গিয়ে শোনেন বাড়ির কর্তা অক্ষয় সরকার চৌধুরী ভিলায় গেছেন। হেমাঙ্গ বাবুর বাড়ি গিয়ে দেখেন সেখানেও শুধু কাজের ছেলেটা আছে--বাড়ির সবাই চৌধুরী ভিলায়।

রতনের বাবাকে চৌধুরীদের বিহারী দারোয়ানটা চেনে। তাঁকে দেখে দরাজ গলায় বললো, 'আইয়ে বাবুজী।' কিন্তু তাঁর পেছনে পিন্টুর বাবাকে দেখে অস্বস্তি বোধ করলো।

রতনের বাবা দারোয়ানকে বললেন, 'হামিদ সাহেব আমার সঙ্গে এসেছেন।'

দারোয়ান অনিচ্ছার সঙ্গে দরজা খুললো। দারোয়ানের হাব ভাব দেখে পিন্টুর বাবা বিরক্ত হলেন। যেন তিনি দাঙ্গা বাঁধাবার জন্য এসেছেন!

চৌধুরী ভিলার মস্ত বড় ড্রইং রুমে পুরোনো দিনের ভেলভেটের গদিমোড়া

চেয়ারে বসেছিলেন নগেন্দ্র চৌধুরী। বয়স প্রায় সত্তরের কাছে, টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। পাশে দুটো সোফায় বসেছে তাঁর দুই ছেলে, একজন ব্রিকফিল্ড দেখে, আরেকজন লঞ্চের কারবার সামলায়। অক্ষয় সরকার আর হেমাঙ্গ লাহিড়ী পাশাপাশি বসেছেন আরেকটা সোফায়। সবাই উত্তেজিত গলায় কি যেন বলাবলি করছিলেন।

রতন আর পিন্টুর বাবা ড্রইং রুমে ঢুকতেই সবাই চুপ হয়ে গেলেন। নগেন্দ্র চৌধুরী বললেন, 'এসো ভায়া দীপঙ্কর। তারপর, কী মনে করে হামিদ সাহেব?'

শেষের কথাটা পিন্টুর বাবার উদ্দেশ্যে বলা। রতনের বাবা বললেন, 'হামিদ সাহেব এসেছেন সবার খোঁজ খবর নিতে। আমরা অক্ষয় বাবু আর হেমাঙ্গ বাবুদের বাড়ি গিয়েছিলাম। শুনলাম ওঁরা এখানে। হামিদ সাহেবের ছেলে পাড়ায় শান্তি কমিটি না প্রতিরোধ কমিটি বানাচ্ছে।'

'নিশ্চয় চাঁদা চাই!'

পিন্টুর বাবা অপ্রসন্ন গলায় বললেন, 'আপনারা কেমন আছেন এটুকুই জানতে এসেছিলাম। ছেলেদের প্রতিরোধ কমিটির জন্য চাঁদা চাইতে আসিনি।'

হেমাঙ্গ বাবু ব্যস্ত গলায় বললেন, 'আপনি কিছু মনে করবেন না হামিদ সাহেব। গতবার আপনার ছেলে ছিলো না। ডালপট্টির মোশারফরা সেবার শান্তি কমিটি করার নামে নগেন বাবুর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছে। এক মাস পাহারা দেয়ার কথা ছিলো ওদের। একটা দোকানও পাহারা দেয়নি। সেবার সূত্রাপুরের সব কটা হিন্দুর দোকান লুট হয়েছে।'

পিন্টুর বাবা রতনের বাবাকে বললেন, 'দাদা আপনি থাকুন, অমি যাই। পিন্টু গিয়ে তপতী আর কেতকীকে নিয়ে আসবে।'

পিন্টুর বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর নগেন্দ্র চৌধুরী রতনের বাবাকে বললেন, 'আমরা কি মরে গেছি দীপঙ্কর বাবু? আমার এত বড় বাড়ি থাকতে আপনার মেয়েরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য মুসলমানদের বাড়িতে আশ্রয় নেবে?'

হেমাঙ্গ বাবু বললেন, 'আমরা জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ওকে নিয়ে তোমার এভাবে আসা উচিত হয়নি দীপঙ্কর।'

রতনের বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এত বছর ধরে এ পাড়ায় আছ, হামিদ সাহেবদের মতো আর একটা সজ্জন পরিবার দেখাও দেখি!'

'কার পেটে কী আছে তা কি কখনও বোঝা যায়!'

'এসব কথা এখন থাক।' নগেন্দ্র চৌধুরী সবাইকে থামিয়ে দিলেন—'দীপঙ্কর ভায়া কি আজ এখানে থাকবে?'

'না।' শক্ত গলায় রতনের বাবা বললেন, আপনার এখানে অক্ষয় আর হেমাঙ্গরা থাকুক। আমরা বাড়িতেই থাকবো।'

'তোমার যা ইচ্ছে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম! গভমেন্টের কাছে একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিতে হবে কাল পরশুর মধ্যে।'

রতনের বাবা এ আলোচনার শুরুতে ছিলেন না। পিন্টুদের সঙ্গে তাদের পরিবারের এত মেলামেশা যে হেমাঙ্গ বাবুরা পছন্দ করেন না এটা তিনি ভালো করেই জানেন। কিছুক্ষণ পর 'আমি যাই', বলে চৌধুরী ভিলা থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

সাত

পরদিন সারা শহরে প্রচন্ড উত্তেজনা। সকালে খবরের কাগজগুলোতে বড় বড় হেডিং করা হয়েছে 'বাবরী মসজিদ বিধ্বস্ত।' কাগজের চেহারা দেখে মনে হয় কে কত বড় হেডিং করতে পারে সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে সবাই।। কোনো কোনো কাগজে খুবই উত্তেজক ভাষায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উস্কে দিয়ে অনেক কথা লিখেছে।

সকালে ঢাকা শহরের কোনো হিন্দুর দোকান খোলেনি। যারা সরকারী চাকরি করে তাদের কেউ কেউ সাহস করে বাড়ি থেকে বের হলেও সবাই ভয়ে বাড়িতে বসে থাকলো। দু' একজন বাধ্য হয়ে বাজারে গিয়ে পরিচিত দোকানিদের কাছ থেকে আজে বাজে কথা শুনে এসেছে।

রাতে রতনের সেজদি আর ছোড়দি পিন্টুদের বাসায় ছিলো। রাতে অবশ্য কোনো গণ্ডগোল হয়নি। সন্ধ্যায় যা দুই একটা মিছিল বেরিয়েছিলো। পিন্টুরা পাড়ায় শান্তি কমিটি করেছে। গত রাতে ইরফান ডালপট্টি, হেমেন্দ্র দাস রোড, রূপচাঁদ লেন, সূত্রাপুর বাজার, গেণ্ডারিয়া আর ফরাসগঞ্জের লোকজনদেরও মিটিং-এ ডেকেছিলো। বেশির ভাগই ছিলো তরুণ, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কয়েকজন সবে চাকরিতে ঢুকেছে। শুধু পিন্টু আর ডালপট্টির সোহরাব ছিলো স্কুলের ছাত্র।

মিটিং-এ ঠিক হয়ে হয়েছে সবাই গ্রুপ ভাগ করে রাত জেগে পালা করে পাড়া পাহারা দেবে। কোথাও হামলা হলে সবাই মিলে শ্লোগান দেবে — 'জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো।' একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের আগে এ শ্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সবাই একজোট হয়েছিলো। হামলাকারীদের যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে। গলির মুখের বাড়িগুলোর ছাদে মেয়েরা ইটের টুকরো, গরম পানি, শুকনো মরিচের গুঁড়ো নিয়ে তৈরি থাকবে। ছেলেরা থাকবে লাঠি হাতে। কারও যদি বন্দুক থাকে সেটাও তৈরি রাখতে হবে। মোট কথা এ এলাকায় কোনো অবস্থায় হিন্দুদের ঘরবাড়ি বা মন্দিরে কাউকে হামলা করতে দেয়া হবে না।

সকালে নাশতা খেয়েই পিন্টু ছুটলো রতনদের বাড়িতে। পাড়ার অন্য হিন্দুরা সব চৌধুরী ভিলায় আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বাড়ির লোহার ফটকের বাইরে চারজন বন্দুকধারী পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। শুধু রতনরা নিজেদের বাড়িতে আছে।

রতনদের বাড়ি গিয়ে পিন্টু দেখলো ওর বাবা, বড়দা কেউ কাজে যায়নি। রতন ভেতরের বারান্দায় বসেছিলো। পিন্টু ওকে জিজ্ঞেস করলো, 'নাশতা

ঃ হিন্দুগো দালালী যারা করবো হ্যাগরে সিদা ইন্ডিয়া পাঠায়া দিমু ···

করেছিস?'

রতন মাথা নাড়লো। ওর মা জানতে চাইলেন, 'তপতী আর কেতকী কেমন আছে বাবা?'

'ঠিকই আছে। এ পাড়ায় কোনো গুণ্ডা বদমাশকে আমরা ঢুকতে দেবো না।'

রতনের বড়দা বললে, 'পাড়ায় না হয় কেউ এলো না। কাজে বেরোবার সাহসও তো পাচ্ছি না।'

রতনের বাবা বললেন, 'কথা নেই বার্তা নেই পাশের বাড়ির ছেলেটা সকালে ইনকেলাব পত্রিকাটা দিয়ে গেছে পড়ার জন্য। পড়তে গিয়ে হাত পা সব হিম হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে বাংলাদেশে একজন হিন্দুও আস্ত থাকবে না।'

গত রাতে ইরফান যেভাবে বলেছিলো—গম্ভীর হয়ে পিন্টু বললো, 'দু একদিন পর সব ঠিক হয়ে যাবে কাকাবাবু।'

রতনের ঠাকুরমা ভাঙা গলায় বললেন, 'তাই যেন হয় বাছা।'

'রতনের মাকে পিন্টু জিজ্ঞেস করলো, 'কাকিমা, বাজার থেকে কিছু আনতে হবে?'

'বাজার করে কী হবে বাবা।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতনের মা বললেন, 'আলু ভাতে ফুটিয়ে রাখবো, কারও ইচ্ছে হলে খাবে।'

রতনদের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিলো বাড়ির কেউ বুঝি কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। পিন্টু আর কোনো কথা না বলে চলে এলো। ভেবেছিলো রতন ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবে, কিন্তু ও এলো না। বারান্দার খামের গায়ে হেলান দিয়ে যেভাবে বসেছিলো সেভাবেই বসে রইলো। পিন্টু বাইরে এসে বললো, 'রতন দরজাটা বন্ধ কর।'

বাড়িতে না গিয়ে পিন্টু সোজা সূত্রাপুর বাজারে এলো। লক্ষ্য করলো বেশ কয়েকটা দোকান বন্ধ। কয়েকজন পরিচিত মাছওয়ালাকেও দেখতে পেলো না। মুদি দোকান থেকে একটা ব্যাগ কিনে দু' সের মুগডাল এক কেজি তেল কিনলো। তরকারির বাজরে গিয়ে দু' কেজি করে আলু, সিম আর ফুলকপি কিনলো। মাছের বাজারে গিয়ে এক কুড়ি শিং আর মাগুর মাছ কিনলো। এ রকম অবস্থা কদিন চলবে কে বলতে পারে! রতনরা বাজারে যেতে পারবে না, ঘর থেকে বেরোতে পারবে না—শেষে কি ওরা না খেয়ে মরবে?

বাজার নিয়ে পিন্টু আবার রতনদের বাড়ি এলো। বাজারের থলেটা রতনের মার হাতে দিয়ে বললো, 'কাকিমা, কোনো কিছুর দরকার হলে রতনকে বলবেন আমাকে খবর দিতে। পাড়ার ভেতর কোনো ভয় নেই।'

রতনের মা শুকনো গলায় বললেন বটে—'এসব কেন আনতে গেলে', কিন্তু তিনি ভালো করেই জানেন ঘরে কয়েক সের চাল ছাড়া খাবার কিছুই নেই। পিন্টু চলে যাওয়ার পর ভাবছিলেন ওকে দিয়ে সের দুই আলু পটল আনিয়ে নিলে ভালো হতো। ছেলেটার জন্য গভীর মমতায় তাঁর বুক ভরে গেলো।

যাবার সময় পিন্টু রতনকে বললো, 'আমি একটু স্কুলের দিকে যাবো। তুই দুপুরে একবার আসিস।'

বাড়িতে মাকে বলে পিন্টু হাঁটতে হাঁটতে লক্ষীবাজারের দিকে গেলো। পথে ঋষিকেশ দাস রোডে একটা মিষ্টির দোকান লুট হতে দেখলো। বেশি নয় দশ বারো জন লোক লাঠি, রড, হকি ষ্টিক হাতে দোকানের কাঠের ঝাঁপ ভেঙে ফেলেছে। কয়েকজনের মুখে দাড়ি, মারমুখী চেহারা। দোকান ভাঙার পর একজন ক্যাশ বাক্স নিয়ে দৌড় দিলো আর রাস্তার টোকাইরা ঝাঁপিয়ে পড়লো শো কেসে সাজিয়ে রাখা মিষ্টির ওপর। বোধ হয় কাল বিকেলে বানানো হয়েছে, প্রায় সবগুলো থালাই ভরা ছিলো নানা রঙের মিষ্টিতে।

অল্প দূরে তামাশা দেখার জন্য লোকজন ভিড় করেছে। দূরে মোড়ের কাছে দুটো পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এদিকে যে এত হল্লা হচ্ছে, সেদিকে ওদের নজরই নেই।

নিজের ওপরই প্রচণ্ড রাগ হলো পিন্টুর। চোখের সামনে এমন একটা অন্যায় ঘটনা দেখেও ওর করার কিছু নেই। সবাই মিলে বাধা দিলে দোকান লুট করতে আসা শয়তানগুলো ঠিকই পালিয়ে যেতো। কেউ কিছু বললো না। বরং কয়েকজনের চেহারা দেখে মনে হলো এতে ওরা খুশি হয়েছে। দ্রুত পা চালিয়ে ওখান থেকে সরে এলো পিন্টু। নিজেকেই ওর অপরাধী মনে হচ্ছিলো।

সোহরাওয়ার্দী কলেজ পেরিয়ে নন্দলাল দত্ত লেনের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো পিন্টু। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, হাতে বাজারের খালি ব্যাগ, গলির মুখে দাঁড়িয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন বুড়ো নলিনী স্যার। গলি পেরিয়ে লক্ষীবাজারের বড় রাস্তায় নামার সাহস পাচ্ছিলেন না তিনি। স্কুলের শুরু থেকে গত দশ বছর যাঁকে ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া দেখেনি, যাঁর চেহারায় সারাক্ষণ কর্তৃত্বপূর্ণ একটা রাগী ভাব ফুটে থাকে, তাঁকে ভীত অসহায় অবস্থায় এরকম পোষাকে দেখে পিন্টুর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। কোথায় কারা কোন বাবরী মসজিদ ভেঙেছে তার জন্য নলিনী স্যারের এ অবস্থা কেন হবে এর কোনো কারণ খুঁজে পেলো না ও।

কাছে এসে নরম গলায় প্রশ্ন করলো, 'স্যার, আপনি কি বাজারে যাচ্ছেন?'

চমকে উঠে পিন্টুর দিকে তাকালেন নলিনী স্যার। যেন অকূল সমুদ্রে ডুবতে গিয়ে একটা শক্ত অবলম্বন খুঁজে পেলেন। ভাঙা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ বাবা। ওদিকে শুনছি লুটপাট আর আগুন লাগানো শুরু হয়ে গেছে। ঘরে এক মুঠো চাল নেই।'

পিন্টু ওঁর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বললো, 'স্যার, আপনি বাড়ি যান। আমি চাল নিয়ে আসছি।'

নলিনী স্যার ওর হাতে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, 'বাবা, পারলে এক সের আলুও এনো।'

কথা না বাড়িয়ে পিন্টু একটা রিকশা ডেকে রায় সাহেবের বাজারে এলো। এ

বাজারের অবস্থাও সূত্রাপুর বাজারের মতো। অনেকগুলো মুদির দোকান বন্ধ। মাছের বাজারও বেশ ফাঁকা। জেলেদের ভেতর এখনও হিন্দুর সংখ্যা কম নয়।

রতনদের জন্য যে রকম বাজার করেছিলো, নলিনী স্যারের জন্যেও সে রকম করলো পিন্টু। স্যারের বাড়িতে ও আগেও কয়েকবার গেছে। বাড়িতে স্যারের স্ত্রী, পিসিমা, এক বিধবা বোন আর দুই মেয়ে আছে। বাড়িতে পুরুষ মানুষ বলতে শুধু তিনি। স্যারের একটাই ছেলে, বিয়ে করে কানাডায় আছে। বাপের কোনো খোঁজ খবর নেয় না। বেতনের টাকায় সংসারের খরচ চলে না বলে স্যার বাড়িতে কোচিং ক্লাস করেন।

বাজার থেকে বেরিয়ে পিন্টু রিকশায় উঠতে যাবে এমন সময় দেখলো রড আর লাঠি হাতে কতগুলো লোক হই হই করে নবাবপুরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। বেশির ভাগই লুঙ্গি পরা। কারো গায়ে সুয়েটার, কারও গায়ে চাদর। ওদের সামনে পায়জামা আর লম্বা কোর্তা পরা দুই কালো দাড়িওয়ালা লোক ছিলো—বোঝা যায় এরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে। মারমুখী মিছিলের শেষে কয়েকটা টোকাইও দৌড়াচ্ছে। পিন্টু জানে নবাবপুরে হিন্দুদের বেশ কিছু দোকান আছে। ওদের ক্লাসে পড়ে দীপক, নবাবপুরে ওদের বিরাট ওষুধের দোকান। তাছাড়া মরণচাঁদের মিষ্টির দোকান, গন্ধবণিকদের পসারির দোকান, ঘোষদের দুধের আড়ত, পদ্মনিধি প্রেস,—সবই নবাবপুরে। লাঠি আর রড হাতে লোকগুলোর লক্ষ্য যে এসব দোকান, বুঝতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

ব্যাগ ভর্তি জিনিসপত্র দেখে নলিনী স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে এত সব কেনার টাকা কোথায় পেলি?'

'টাকা আমার কাছে ছিলো স্যার।'

'নিশ্চয় বাড়ির টাকা! কত খরছ হয়েছে বল, আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

'বাড়ির টাকা না স্যার। এটা আমার নিজের কামাই করা টাকা।'

'তুই কোত্থেকে টাকা কামাই করলি?'

'আমি সূত্রাপুর ক্লাবে ফুটবল খেলে পেয়েছি স্যার। আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে পারবো না।'

'তা হয় না—পিন্টু। তুই কেন আমার জন্য এতগুলো টাকা খরচ করবি?'

'স্যার, আমাদের মতো গাধা পিটিয়ে আপনি মানুষ করেছেন। সারা জীবনই আমাদের দিয়ে এসেছেন। ক্লাসে আপনিই বলেন—শিক্ষক পিতার তুল্য। ছেলে হয়ে এটুকুও কি করতে পারবো না?'

নলিনী স্যার পিন্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। খেলাধুলোর ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই বলে পিন্টুকে কখনও আলাদা ভাবে তিনি দেখেননি। ক্লাসের অন্য সব ছেলের মতোই ওকে জানেন। ও কার ছেলে, কোথায় থাকে তাও তিনি জানেন না। তাঁর নিজের ছেলে তাঁকে ভুলে গেছে আর এমন ঘোর বিপদের দিনে কোন বাড়ির ছেলে এসে আপনজনের মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছে,

ভাবতে গিয়ে তাঁর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ধরা গলায় বললেন, 'পিন্টু, চারদিকে এত অন্যায়, অবিচার দেখে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। তোকে দেখে মনে হচ্ছে এখনো পৃথিবীর সবটুকু পাপে ভরে যায় নি। তোকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি বাবা, জীবনে তুই অনেক বড় হবি।'

স্যারের কথা শুনে পিন্টুর কান্না পেলো। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বললো, 'স্যার, আপনার আশীর্বাদের চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে!'

কোনো কথা না বলে বুড়ো সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ নলিনী ভট্টাচার্য বিধর্মী ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

যে কজনকে খবর দেয়া সম্ভব হয়েছে সবাইকে নিয়ে বিকেলে পিন্টুদের ছাদে জরুরি বৈঠকে বসলো ইরফান। রতনদের বাসায় গিয়ে ওকে আর স্বপনকে ও নিজেই নিয়ে এসেছে। বলেছে, 'মার খাওয়ার ভয়ে তোরা ঘরে কেন লুকিয়ে থাকবি? কেউ মারতে এলে রুখে দাঁড়াতে হয়।'

সরকারদের বড় ছেলে বাসব ইরফানদের বয়সী, সেও এসেছে বৈঠকে। পিন্টু গুণে দেখলো সব মিলিয়ে পনেরো জন। দুটো বড় চাদর বিছিয়েছিলো ছাদে। তাতেও সবার জায়গা হয়নি। রতন বসেছে পাচিলের গায়ে হেলান দিয়ে।

ইরফান বললো, 'আমি আজ শহরে বেরিয়েছিলাম। অবস্থা ভালো নয়। গুণ্ডারা ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হামলা করেছে। অনেকগুলো দোকান ভেঙে লুটপাট করেছে।'

পিন্টু বললো, 'ঋষিকেশ দাস রোডে মিষ্টির দোকান আমার চোখের সামনে লুট হয়েছে।'

বাসব বললো, 'নগেন বাবু খবর পেয়েছেন আজ রাতে নাকি সূত্রাপুর বাজার লুট হবে।'

'হতে পারে।' ইরফান বললো, 'আমাদের সব রকম খারাপ পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমি সূত্রাপুরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের কমিটিতে আওয়ামী লীগ, জাসদ, বাসদ, কমিউনিস্ট পার্টি—সব দলেরই ছেলেরা আছে। বাজার পাহারা দেয়ার দায়িত্ব ওরা নিয়েছে। আমরা পাড়ায় পাড়ায় কাল রাতের মতো পাহারা দেবো। লক্ষ্য রাখতে হবে বাবরী মসজিদ ভাঙার কথা বলে কেউ যেন উত্তেজনা ছড়াতে না পারে। আমাদের বলতে হবে বাংলাদেশের হিন্দুরা বাবরী মসজিদ ভাঙেনি। একাত্তর সালে আমরা মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সবাই মিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি, দেশের জন্য হিন্দু, মুসলমান সবাই জীবন দিয়েছে। সবার এদেশে থাকার সমান অধিকার আছে। ধর্মের নামে যারা নিরীহ মানুষের ওপর হামলা করে, জিনিসপত্র লুট করে, দোকান-পাট, মন্দির, মসজিদ ভেঙে ফেলে, ঘর বাড়িতে আগুন দেয়—তারা হিন্দুও না মুসলমানও না, তারা অসভ্য জানোয়ার। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।'

সবাই গভীর আগ্রহ নিয়ে ইরফানের কথা শুনছিলো। হঠাৎ দূরে লোকজনের হইচই আর শ্লোগানের শব্দ শোনা গেলো। সবাই কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো। সামনের রাস্তায় কয়েকটা দোকান ঝটপট করে ঝাঁপ নামিয়ে দিলো। দূরে ডালপট্টির ওদিক থেকে দাড়িওয়ালা মোল্লাদের মিছিল আসছিলো। শ্লোগান দিচ্ছে, 'নারায়ে তকবির....,' 'একটা একটা মালাউন ধর, সকাল বিকাল নাশতা কর।' 'ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান।' 'হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, বাংলা ছেড়ে ভারত যাও।'

শ্লোগানের কথা শুনে রতনের বুক কেঁপে উঠলো। ইরফানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। বললো, 'সবাই লাঠি নে। আমরাও মিছিল বের করবো।'

পিন্টুদের ছাদে আগের দিন সন্ধ্যায় সূত্রাপুর বাজার থেকে এক মণ গজারির লাঠি এনে রাখা হয়েছিলো। ইরফানের বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই লাঠি হাতে নিয়ে নিচে নামলো। কয়েকজন দুই হাতে দুই লাঠি নিয়েছে।

রাস্তায় নেমেই ইরফান শ্লোগান দিলো, 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই।' অন্যরা বললো, 'ভাইয়ে ভাইয়ে ভেদ নাই।'

শ্লোগানের শব্দ শুনে চৌধুরী ভিলা থেকে কয়েকজন যুবক বেরিয়ে এলো। ইরফান মিছিল নিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিলো—'মন্দির মসজিদ ভাঙে যারা,' অন্যরা বললো, 'সব ধর্মের শত্রু তারা।' ইরফান বললো, 'তুমি কে আমি কে,' সবাই বললো, 'বাঙ্গালী, বাঙ্গালী।' ইরফান বললো, 'দুই দেশের দুই খুনী।' অন্যেরা বললো, 'গোলাম আযম, আদভানি।' ইরফান বললো, 'জামাত শিবির রাজাকার।' অন্যেরা বললো, 'এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়।' ইরফান বললো, 'তোমার আমার ঠিকানা।' সবাই বললো, 'পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।' মিছিল নিয়ে ইরফান এগিয়ে গেলো ডালপট্টির দিকে।

উল্টো দিক থেকে আসা দাড়িওয়ালাদের মিছিল ইরফানদের দেখে থমকে দাঁড়ালো। রূপচাঁদ লেনের মাহবুব ছিলো ইরফানদের মিছিলে। ও নিয়মিত নির্মূল কমিটির মিটিঙে মিছিলে যায়। ইরফানকে বললো, 'রাজাকার গুলারে একটা ধাওয়া দেই ইরফান ভাই। আমি শ্লোগান দিমু। সবাই খালি কইবা জবাই কর।'

মাহবুব মিছিলের মাঝখান থেকেই চেঁচিয়ে বললো,—'এই-ই জামাত ধর।' সবাই বললো, 'জবাই কর।'

মাহবুব লাঠি উঁচিয়ে সামনের দিকে ছুটলো। এরপর ইরফানদের মিছিলের সবাই—'জামাত ধর জবাই কর, শিবির ধর জবাই কর, গোলাম ধর জবাই কর, আযম ধর জবাই কর, আবার জামাত ধর জবাই কর.....' বলতে বলতে ডালপট্টির দিকে দৌড়ালো। ইরফানকে এলাকার সবাই চেনে। ওদের দৌড়াতে দেখে সামনে থেকে লোকজন সরে গেলো। কেউ মিছিলে জুটে গেলো, অনেকে রাস্তার দু' পাশে দাঁড়িয়ে তালি দিয়ে ওদের উৎসাহিত করলো।

পিন্টু আর রতন আগে কখনও মিছিলে যায়নি। একুশে ফেব্রুয়ারিতে ওরা

প্রভাতফেরি করে বটে, কিন্তু সেখানে গান হয়, শ্লোগান হয় না। ওরা দু'জন এমনিতেই উত্তেজিত ছিলো। মাহবুবের জবাই করার শ্লোগান ওদের আরও উত্তেজিত করলো। পিন্টুর মনে হলো,—যারা নিরীহ মানুষকে খুন করতে পারে, গরিব মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে পারে, তাদের ধরতে পারলে লাঠির বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়া উচিৎ।

ডালপট্টির মোড়ে থমকে দাঁড়ানো মোল্লাদের মিছিলটা উল্টোদিক থেকে লাঠি হাতে ভয়ঙ্কর রাগী মিছিল আসতে দেখে রণে ভঙ্গ দিলো। যে যেদিকে পারলো চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেলো।

ইরফানরা ডালপট্টির মোড়ে এসে থামলো। মিছিলের ভেতর থেকে একজন বললো, 'ইরফান ভাই আপনি কিছু বলেন।'

সামনে ছিলো শিকদারদের বাড়ির উঁচু বারান্দা। এক লাফে বারান্দায় উঠে ইরফান ছোট খাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললো। পিন্টুদের ছাদে যে কথাগুলো বলেছিলো সেগুলোই আরও গুছিয়ে বললো।

পিন্টু রতনের হাত ধরে পেছনে দাঁড়িয়েছিলো। বেশ কিছু পথচারীও দাঁড়িয়ে গেছে বক্তৃতা শুনতে। রতনের মনে হলো—ওরা একা নয়, এখন আর ভয়ের কিছু নেই।

আট

সূত্রাপুর এলাকায় দাঙ্গা যাতে না হয় সেজন্য ইরফানরা সব রকম ব্যবস্থাই নিয়েছিলো। রতন আর পিন্টু ভেবেছিলো অন্যান্য জায়গায় বুঝি এভাবেই দাঙ্গাবাজদের রুখে দেয়া হয়েছে। রাতে রতন এসেছিলো পিন্টুর সঙ্গে ঘুমোতে। কাল থেকে তপতী আর কেতকী হাসির ঘরে থাকছে। পিন্টুদের রাত পাহারার ডিউটি ছিলো নটা থেকে বারোটা পর্যন্ত। ইরফান প্রত্যেক এলাকায় চারটা করে টীম তৈরি করে দিয়েছে। প্রত্যেক টীম পালা করে তিন ঘন্টা পাহারা দেবে। বয়সে যারা ছোট তাদের দেয়া হয়েছে নটা বারোটার টীমে। কাগজিটোলায় পিন্টুদের টীমে ছিলো আটজন। পিন্টুকে বানানো হয়েছে টীম লিডার। সবাইকে ও বলেছে খেয়ে দেয়ে পৌনে নটার ভেতর ওদের বাসায় চলে আসতে। রতন বিকেল থেকেই পিন্টুর সঙ্গে রয়েছে। মিছিল শেষ করে স্বপন বাসায় ফিরে গেছে।

এক হাতে গজারির লাঠি, আরেক হাতে পাঁচ ব্যাটারির লম্বা টর্চ, গায়ে মোটা সুয়েটার আর মাথায় উলের মাফলার পেঁচিয়ে পাড়ায় টহল দিতে দিতে নিজেকে খুব দায়িত্বশীল মানুষ মনে হচ্ছিলো পিন্টুর। যদিও রতনকে বলেনি, মনে মনে ও চাইছিলো গুণ্ডারা একবার হামলা করতে আসুক ওদের পাড়ার। ও ঠিক করে রেখেছে সব কটাকে ঠ্যাং ভেঙে নুলো করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে। আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে শুকনো নারকেলের মতো এক বাড়িতে মাথা ফাটিয়ে দেবে।

যারা সূত্রাপুর বাজার লুট করার কথা ভেবেছিলো বিকেলে ইরফানদের ধাওয়া

খেয়ে ওরা দমে গেছে। রাতে আর এ এলাকায় হামলা করার সাহস কারও হয়নি। পিন্টুদের পরের ব্যাচে ছিলো স্বপনরা। ওরা বেরিয়ে আসার পর পিন্টু ওর টীমের সবাইকে যার যার বাড়ি পাঠিয়ে দিলো। বলে দিলো সবাই যেন আবার কাল বিকেলে ইরফানের মিটিঙে চলে আসে।

ডিসেম্বরের রাত বারোটা মানে গভীর রাত। বাসার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকে কাপড় বদলে পিন্টু আর রতনও বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। রতন বিছানায় শুয়ে ওর দিদিদের কথা ভাবছিলো। বড়দি ভোলায়, মেজদি চট্টগ্রামে। কে জানে ঢাকার মতো সে সব জায়গার মোল্লারাও ক্ষেপে গেছে কিনা। ওর বাবা দুপুরে চৌধুরী ভিলা থেকে চট্টগ্রাম আর ভোলা দু জায়গাতেই ফোন করার চেষ্টা করেছেন, লাইন পাননি। বাড়িতে বড়দা অবশ্য বলেছে ওসব জায়গায় কিছু হলে খবরের কাগজে নিশ্চয় বেরুতো।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পরও রতনের ঘুম আসছিলো না। কোথায় কোন মসজিদ কারা ভেঙেছে তার জন্য ওদের উপর কেন হামলা হবে এটা সে কিছুতেই মানতে পারছিলো না। পাশে শুয়ে আছে ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ পিন্টু, এতক্ষণে হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছে। পিন্টুকে ও ভাবে ওরই বুঝি আরেক রূপ, অবনী স্যার বলেন 'হরিহর আত্মা।' অথচ পিন্টুর কোনো ভয় নেই। ও শহরে ঘুরতে যেতে পারে, ওকে কেউ কিছু বলবে না। রতনের গলির বাইরে যাওয়া বারণ। ও কী অপরাধ করেছে? বাবা, বড়দা কেউ আজ কাজে যায়নি। পিন্টু বলেছে শহরে হিন্দুদের দোকান পাট সব বন্ধ। ডালপট্টিতে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় রতনও দেখেছে রহমত ব্যাপারীর গদি খোলা অথচ ঠিক তার পাশে সাহাদের গদিতে তালা মারা। সকালে মা বলছিলেন তপতী আর কেতকীকে কলকাতা পাঠিয়ে দেবেন। স্বপন বলেছে, 'আমিও কইলকাতা যামু গিয়া। এই দ্যাশে আমার কপালে কুনদিন চাকরি জুটবো না।' রতন কিছু বলে নি। আজ পিন্টুর সঙ্গে বাইরে যেতে না পেরে ওর বুকের ভেতর প্রচণ্ড অভিমান জমেছে। বার বার মনে হয়েছে—এ শহর কি পিন্টুর, রতন কি এ শহরে জন্মায়নি? শহরের কোন উৎসবে সে যায়নি? গত চার বছর ধরে ওরা একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাত ফেরি নিয়ে শহীদ মিনারে যায় ফুল দিতে। সবার সঙ্গে রতনও গায় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী . . .।' আজ মনে হচ্ছে সালাম, বরকত, জব্বর ওর ভাই নয়। এ শহর ওর নয়। এখানে ওকে থাকতে হলে সবার দয়ার আশ্রয়ে থাকতে হবে, পিন্টুরা যেমন ওদের তিন ভাই বোনকে আশ্রয় দিয়েছে। রতন আগে বহুবার পিন্টুদের বাসায় থেকেছে। আগেকার থাকা আর আজকের থাকার ভেতর অনেক তফাৎ। এভাবে তো পিন্টুরা কখনও রতনদের বাসায় থাকেনি? পিন্টু ওর দশ বছরের বন্ধু। আজ প্রথম মনে হলো পিন্টু আর ও এক নয়। কথাটা মনে হতেই ওর বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেলো। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো রতন।

পিন্টু জেগেছিলো। রতনের মতো সেও এসব কথা ভাবছিলো। রতনের পাশে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিলো। সকালে নলিনী স্যারের ভয় পাওয়া শুকনো চেহারা আর অস্বাভাবিক পোষাক দেখে মনে হয়েছিলো বুঝি এর জন্য ও দায়ী। নইলে ওর কেন ভয় নেই? নলিনী স্যার কেন ওর মতো নিশ্চিন্ত মনে রিকশা ডেকে বাজারে যেতে পারলেন না?

বিকেলে মিছিল নিয়ে ওরা যখন ডালপট্টির দিকে যাচ্ছিলো তখন ও রতনের মুখে প্রচণ্ড ভয়ের ছায়া দেখেছে। সারাক্ষণ ও রতনের হাতে হাত রেখে হেঁটেছিলো। মনে মনে বলছিলো, 'রতন ভয় পাবি না, আমি তোর পাশে আছি।' নিজের বুকের সাহস ভয়ার্ত বন্ধুর বুকে সঞ্চারিত করতে চাইছিলো পিন্টু। হঠাৎ রতনের চাপা কান্নার শব্দ শুনে চমকে উঠলো ও। উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিলো রতন। পিন্টু ওর পিঠে হাত রেখে উদ্বিগ্ন গলায় বললো, 'রতন কী হয়েছে? খারাপ স্বপ্ন দেখেছিস?'

পিন্টুর ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে রতনের চোখে বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো কান্নার ঢল নামলো। পিন্টু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ব্যকুল গলায় বললো, 'কী হয়েছে রতন? আমার ভাই, এভাবে কাঁদিস না। বল কী হয়েছে।'

ধীরে ধীরে রতনের কান্না থামলো। পিন্টু ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছিলো, 'তোর কোনো ভয় নেই রতন। চিরকাল আমি তোকে এভাবে আগলে রাখবো। আমার জান থাকতে তোর কোনো ক্ষতি হতে দেবো না।'

রতন জানে পিন্টু ওকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছে না। ও যতক্ষণ পাশে আছে রতনের কিছু হবে না। তারপরও আজকের ঘটনা জানিয়ে দিয়েছে রতন আর পিন্টু এক নয়। আস্তে আস্তে ও পিন্টুকে বললো, 'আমার একটা কথার জবাব দে।'

'কী কথা রতন?'

'আমি যে হিন্দু—এর জন্য কি আমি দায়ী?'

'এ কথা কেন ভাবছিস রতন?'

'কোনোদিন ভাবিনি। আজ সবাই আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছে।'

'নলিনী স্যারের কথা ভুলে গেছিস রতন? স্যার তো সব সময় বলেন, আমার হিন্দু না মুসলমান এটা কোনো পরিচয় হতে পারে না। আমরা মানুষ, এটাই আমাদের বড় পরিচয়। হরিমতিয়াকে তুই কী বলেছিলি মনে নেই?'

'কী বলেছিলাম?'

'হরিমতিয়ার মা যখন জানতে চেয়েছিলো আমরা হিন্দু না মুসলমান, তুই বলেছিলি আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই, আমরা মানুষ।'

'সে তো বইয়ের কথা। নলিনী স্যারের শেখানো কথা।'

'এভাবে কেন বলছিস রতন! স্যার কি আমাদের ভুল শিখিয়েছেন?'

'নলিনী স্যারের কথা যদি সত্যি হবে তাহলে আজ তাঁকে কেন ধুতির বদলে পায়জামা পরতে হলো? যাঁর ভয়ে স্কুলের সবাই কাঁপে তিনি কিসের ভয়ে আজ

অন্যরকম হয়ে গেলেন?'

পিন্টু কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলো না। রতন অসহিষ্ণু গলায় আবার বললো, 'জবাব দে পিন্টু, নলিনী স্যার যদি হিন্দু না হতেন, আজ কি এই দূরবস্থায় পড়তে হতো তাঁকে? তুই না গেলে হয়তো সারাদিন ওঁরা না খেয়ে থাকতেন। কেন আমদের এরকম ভয়ের ভেতর থাকতে হবে?'

পিন্টু বললো, 'সাপকে মানুষ ভয় পায় রতন। ঘরের ভেতর হঠাৎ যদি সাপ দেখা যায় আমরা প্রথমে ভয় পাই। তারপর সবাই মিলে সাপটাকে মরি।'

'এ সাপ মানুষ বেছে কামড়ায়। সবাইকে কামড়ায় না।'

'ইরফান ভাই পরশু রাতে আমীর হোসেনের কথা বলেছিলো, তুই শুনিসনি। পাকিস্তান আমলে রায়ট ঠেকাতে গেলে মুসলমান গুণ্ডারাই তাঁকে মেরেছিলো। বিকেলে আমরা যেভাবে মিছিল নিয়ে গিয়েছিলাম, ওরা যদি সংখ্যায় বেশি হতো, যদি তৈরি থাকতো, তাহলে আমাদের অনেককেই মারতে পারতো।'

'তুই যাই বলিস পিন্টু, সকালে তুই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে পারিস নি। এর কারণ তো একটাই, আমি হিন্দু। এদেশের অনেক মানুষ মনে করে এটা হিন্দুদের দেশ নয়।'

'পরশু দিন ক্লাবে লালু ভাইকেও ইণ্ডিয়ার দালাল বলেছে। কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, করতে দে। তেড়ে এলে লাঠি ঘুরিয়ে মাথায় বাড়ি মারবি।' এই বলে একটু থামলো পিন্টু। তারপর রতনের একটা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললো, 'কাল থেকে তুই আমার সঙ্গে শহরে যাবি।'

আট তারিখ ছিলো জাতীয় সমন্বয় কমিটির হরতাল। গোলাম আযমের ফাঁসি আর জামাত শিবিরের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধ করার দাবিতে বাবরী মসজিদ ভাঙার আগেই তারা হরতাল ডেকেছিলো। জামাতীরাও একই দিনে হরতাল ডাকলো বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে। সারাদিন শহরে দুই দলের কর্মীদের মধ্যে মারপিট হলো। পিন্টুরা পাড়ার বাইরে যায়নি। নয় তারিখ সকালে খবরের কাগজ দেখে রতন আর পিন্টুর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। শুধু ঢাকায় নয়, দেশের বহু জায়গায় হিন্দুদের ওপর হামলা হয়েছে। ঘর বাড়ি, মন্দির, দোকানপাট আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে দাঙ্গাবাজরা, লুটপাট করেছে বহু জায়গায়। তখন পর্যন্ত কেউ মারা না গেলেও হামলায় অনেকে আহত হয়েছে। রতন আরও বেশি ভয় পেলো, যখন পত্রিকায় দেখলো ভোলা আর চট্টগ্রামেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে পিন্টুকে বললো, 'আমি এখনই বাড়ি যাবো।'

পিন্টু বললো, 'চল, আমিও যাই।'

খবরের কাগজ আসার আগেই পিন্টুরা সকালের চা নাশতা খেয়ে নিয়েছিলো। কাপড় বদলে ও রতনের সঙ্গে ওদের বাড়িতে গেলো।

বাড়ির কাঠের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিলো। রতন জোরে কড়া নাড়তেই

ঃ এ সময়ে রতনকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো?

ভেতর থেকে ভয় পাওয়া ভাঙা গলায় ওর বাবা বললেন, 'কে?'

রতন বললো, 'বাবা, আমি।'

রতনের বাবা দরজা খুললেন। রতন আর পিন্টু ঘরের ভেতরে ঢুকতেই তিনি ব্যস্ত হাতে দরজা বন্ধ করলেন। ওদের বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হয় না। রতন ওর বাবাকে শুকনো গলায় বললো, 'সংবাদে লিখছে চট্টগ্রাম আর ভোলায়ও নাকি গণ্ডগোল লাগছে।'

'মানুষ মরছে?'

'না, মানুষ মারনের কথা ল্যাখে নাই। তয় গ্যারামের দিকে ঘর বাড়িতে আগুন দিছে, মন্দির ভাঙছে, দোকানপাট লুট করছে।'

নিজের কপাল চাপড়ে অসহায় গলায় রতনের বাবা বললেন, 'হায় ভগমান, আমি অখন কই যাই!'

পিন্টু বললো, 'কাকাবাবু, আমি এখনই যাচ্ছি টেলিফোন করতে। আপনি দিদিদের নম্বর দিন।'

রতন বললো, 'আমি নম্বর জানি। বাবা, পিন্টুর লগে যামু আমি?'

'তোর যাওন কি ঠিক ওইবো?'

'আপনি রতনের জন্য ভাববেন না।' শক্ত গলায় পিন্টু বললো, 'আমি থাকতে রতনের কিছু হবে না।'

ভেজা গলায় রতনের বাবা বললেন, 'ঠিক আছে যাও। তুমি ছাড়া রতনের আর কে আছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামার পর রতন জানতে চাইলো, 'ফোন কোত্থেকে করবি?'

'পোস্ট অফিস খুলে গেছে। চল, ওখানেই যাই। আসার পথে স্কুলটা ঘুরে আসবো।'

ওরা দুজন গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই ইরফানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। পিন্টুর সঙ্গে রতনকে বাইরে যেতে দেখে ইরফান অবাক হলো—'রতনকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাচ্ছো পিন্টু?'

'পোস্ট অফিস যাচ্ছি টেলিফোন করতে। চট্টগ্রাম আর ভোলায় রতনের দুই দিদি আছেন।'

'পোস্ট অফিসে এত লোকজনের ভেতর রতনকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আমার চেম্বারে চল, ওখান থেকে টেলিফোন করা যাবে।'

বড় রাস্তায় দোকানপাটের চেহারা কালকের মতোই। হিন্দুদের একটা দোকানও খোলেনি। সাহাদের গদির বাইরে রোয়াকে দুটো পুলিশ বসেছিলো।

ইরফানের ফার্মেসি খুলেছে, তবে ওদের হিন্দু কর্মচারী শিবু আসেনি। ইরফান গতকাল ওদের বাড়িতে গিয়ে খবর নিয়েছিলো। বলেছে অবস্থা একটু শান্ত হলে বাড়ি থেকে বেরোতে।

রতনের কাছ থেকে নম্বর নিয়ে পিন্টু প্রথমে ভোলায় ফোন করলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লাইন পেয়ে গেলো। ওপাশে শেখরদা নিজে ফোন ধরেছে। পিন্টু জানতে চাইলো—'শেখরদা, আপনাদের ওখানকার খবর কী?'

'বেশি ভালো না। শহরের বাইরের অবস্থা খুবই খারাপ। শহরের ওপর তিনটা মন্দির ভেঙেছে।'

পিন্টুর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে রতন বললো, 'শেখরদা, বড়দি কই? বড়দিরে ফোন দেন।'

ওপাশে ওর বড়দি টেলিফোন ধরেই কেঁদে ফেললেন—'রতন, তোরা কেমন আছস? ঢাকার অবস্থা কেমন?'

'ঢাকার অবস্থা সুবিধার না। তয় আমগো এদিকে গণ্ডগোল করবার দেই নাই। কাল আইছিলো, সবতে মিলা ধাওয়া দিছি।'

'তপু, কেতুরে বাড়ির থনে বাইর ওইতে দিস না। বাবারে কইস, গণ্ডগোল একটু কমলে আমরা ঢাকা আসুম। তগো অখন ভোলা আসনের দরকার নাই। লালমোহনের খবর খুব খারাপ।'

'সেজদি আর ছোড়দি পিন্টু গো বাড়িত আছে। আমরা কেউ পাড়ার থনে বাইরে যাই না। বাবায় কইতাছে সেজদি গো কইলকাতা পাঠায়া দিবো।'

'আমি আইয়া লই। একলগে বইসা বুজ করুম। নবনীর কুন খবর পাইছস?'

'অখন ফোন করুম। আইজ রাখি বড়দি। কুন কিছু ওইলে এই নম্বরে ফোন কইরো। এইটা ইরফান বাইর নম্বর।' ইরফানের ফার্মেসির ফোন নম্বর বলে রতন রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

পিন্টু জানতে চাইলো, 'বড়দিরা কি ঢাকা আসবে?'

বললো, 'গণ্ডগোল কমলে আসবে। আমাদের এখন ভোলা যেতে মানা করেছে।'

কাষ্ঠ হেসে পিন্টু বললো, 'ভোলা যাওয়ার কথা আমার মনেই ছিলো না। তিনটা টিকেট শুধু নষ্ট হলো।'

'তুই টিকেটের মায়া করছিস!' বিষণ্ন গলায় রতন বললো, 'ঘর বাড়ি হারিয়ে কত মানুষ রাস্তার ফকির হয়ে গেলো!'

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য পিন্টু বললো, 'মেজদির নম্বর দে। দেরি করলে লাইন পাওয়া যাবে না।'

চট্টগ্রামে রতনের মেজদির অবস্থাও ভোলার বড়দির মতো। বললো, সীতাকুণ্ডের ওদিকে নাকি হিন্দুদের কারও ঘরবাড়ি আস্ত নেই। লুটপাট করে, পুড়িয়ে সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

ফার্মেসি থেকে বেরিয়ে রতন বললো, 'বাড়িতে খবরটা দিয়ে একবার শ্যামবাজারের দিকে যাবি পিন্টু?'

'শ্যামবাজারে কেন?'

'বাবার আড়তের কী অবস্থা দেখে আসি। বসাক বাবুরা তো একই বাড়িতে থাকেন।'

'চল যাই।' বলে পিন্টু একটা রিকশা ডাকলো।

শ্যামবাজার পর্যন্ত হিন্দুদের একটা দোকানও খোলা ছিলো না। বসাকদের চালের আড়তের ভারি কাঠের দরজায় মস্ত বড় তালা ঝুলছে। আড়তের পাশ দিয়ে ওপরে যাওয়ার পথ। রতন বললো, 'চল, মদন জ্যাঠার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

অন্য সময় হলে পিন্টু আপত্তি করতো না। এখনকার পরিস্থিতি আলাদা। একটু ইতস্তত করে বললো, 'আমার যাওয়া কি ঠিক হবে রতন! বরং আমি এখানে দাঁড়াই, তুই দেখা করে আয়।'

পিন্টু কেন আসতে চাইছে না এটা বুঝতে পেরে রতনের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ধরা গলায় বললো, 'ঠিক আছে পিন্টু, 'আমি এক্ষুণি আসছি।'

রতন ওপরে যাওয়ার একটু পরেই ফরাসগঞ্জের দিক থেকে 'নারায়ে তকবির . . .' বলতে বলতে মোল্লাদের একটা মিছিল এগিয়ে এলো। বসাকদের আড়তের সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো পিন্টু। মিছিলওয়ালারা আড়তের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বসাকদের বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে মারলো। মিছিলের পেছনে পুলিশের ভ্যান ছিলো। পুলিশ কিছু বললো না। মিছিল চলে গেলো সূত্রাপুরের দিকে। পিন্টুর বুকের ভেতর রাগ আর ঘৃণার আগুন তখন দাউদাউ করে জ্বলছিলো। অথচ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তখন ওর কিছুই করার ছিলো না।

নয়

শ্যামবাজার থেকে পিন্টু আর রতন এলো ইসলামপুর। অনেকগুলো জুয়েলারি শপ এখানে। বেশির ভাগ স্বর্ণকারই হিন্দু। ফাঁকে ফাঁকে দু' একটা মুসলমানদের দোকানও আছে। এসব দোকানের মালিকও আগে হিন্দু ছিলো। দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় আগে তারা দোকান বিক্রি করে দিয়ে গেছে।

ইসলামপুরের জুয়েলারি পাড়ার একটা দোকানও খোলা ছিলো না। দু' বছর আগে বাবরী মসজিদ ভাঙা হয়েছে বলে এক পত্রিকা গুজব রটিয়ে রায়ট বাঁধিয়ে দিয়েছিলো। তখন ইসলামপুরের বেশ কয়েকটা সোনার দোকান লুট হয়েছে। জুয়েলারি পাড়ার মাথায় কোতোয়ালি পুলিশ ফাঁড়ি। পিন্টু লক্ষ্য করলো এ পাড়ায় লোকজনের চলাফেরাও খুব কম। সবাই আশঙ্কা করছে—কখন হামলা হয়! রতনের বড় ভাই যতীন কাজ করে সাহাদের দোকানে। অন্য সব দোকানের মতো সাহাদের দোকানও বন্ধ। পিন্টু বললো, 'সাহারা কোথায় থাকে?'

'ঠাটারি বাজারের বামাচরণ চক্রবর্তী রোডে।'

'যাবি ওখানে?'

'তোর যদি অসুবিধে না হয় চল।'

'অসুবিধে আর কি! রিকশায় করে চলে যাবো!'

রতন লক্ষ্য করেছে শহরে লোকজন আর রিকশা বাসের সংখ্যা অন্য দিনের চেয়ে কম। ঈদের পরদিন রাস্তাঘাট যেমন ফাঁকা থাকে, অনেকটা সেরকম মনে হচ্ছে, তবে লোকজনের চেহারায় উদ্বেগ আর উত্তেজনা। ওদের দিকে কেউ লক্ষ্য করেনি। বড়দার কাছে শুনেছে একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী সৈন্যরা নাকি কাপড় খুলে দেখতো কে হিন্দু আর কে মুসলমান। প্রথম দিকে হিন্দু পেলেই মেরে ফেলেছে। পরে অবশ্য মুসলমানদেরও রেহাই দেয়নি, সব বাঙালিই ওদের শত্রু ছিলো।

পিন্টুদের রিকশা রথখোলার মোড় পেরিয়ে নাবাবপুরের রাস্তায় বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে তখনই মানসী সিনেমার ওদিকে হইহল্লার শব্দ শোনা গেলো। 'নারায়ে তকবির . . .' অস্পষ্ট শ্লোগানও শোনা গেলো। মোগলটুলির ভেতর থেকে পাঁচ ছটা লোক লোহার রড হাতে দৌড়ে গেলো সেদিকে। পিন্টু বললো, 'নির্ঘাত কারও দোকান লুট হচ্ছে।'

রতন বললো, 'আর গিয়ে কাজ নেই। চল, এখান থেকে ফিরে যাই।'

পিন্টুদের রিকশা ছাড়া ফুলবাড়িয়ার দিকে আর কোনো রিকশা বা গাড়ি যাচ্ছিলো না। অবশ্য এমনিতে এটা ওয়ান ওয়ে রোড। ফাঁকা ছিলো বলে পিন্টুদের রিকশাওয়ালা ইংলিশ রোড হয়ে ঘুরে না গিয়ে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। উল্টো দিক থেকে জোরে প্যাডেল মেরে এগিয়ে আসছিলো এক কমবয়সী রিকশাওয়ালা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ছেলেটা পিন্টুদের বয়স্ক রিকশাওয়ালাকে বললো, 'চাচা, ওইদিকে কই যাও? ঠাটারি বাজারের মন্দিরে আগুন দিছে। হিন্দুগো দোকান লুট ওইতাছে। পুলিশ ধাওয়া দিছে।' বলতে বলতে ওদের পাশ কাটিয়ে রথখোলার দিকে চলে গেলো ছোকরা রিকশাওয়ালা।

ছেলেটার কথা শুনে পিন্টুদের রিকশাওয়ালা ঘুরে তাকালো। বললো, 'আপনেরা কি আরও যাইবেন, না রিকশা ঘুরামু?'

পিন্টু বললো, 'রিকশা ঘোরান। লক্ষীবাজার চলেন।'

গতকাল ও স্কুলের ভেতরে যেতে পারেনি। ব্রাদাররা নিশ্চয় বলতে পারবেন ওদের হিন্দু টিচাররা কেমন আছেন। কথাটা ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই নিজেকে ছোট মনে হলো পিন্টুর। ওদের স্কুলে হিন্দু টিচারের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু আগে কখনও ভাবেনি কে হিন্দু কে খৃষ্টান আর কে মুসলমান। টিচাররা নিজেরাও কখনও ছাত্রদের এসব বুঝতে দেননি। ওদের স্কুলে ঈদে মিলাদুন্নবীতে মিলাদ হয়। হিন্দু ছাত্ররা চাঁদা না দিলেও মিষ্টি খেতে যায়। সরস্বতী পূজার আয়োজন হিন্দু ছেলেরা করে, তবে মিষ্টি খাওয়ার সময় কোনো বাছ বিচার নেই। খৃষ্টান ছেলেদের সঙ্গে হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে বড়দিন করে।

স্কুলের দিকে ওদের রিকশা যত এগিয়ে যাচ্ছিলো পিন্টুর ততই খারাপ লাগছিলো। ওখানে গিয়ে কী শুনবে, কী দেখবে কে জানে! ঠাটারি বাজারের

মন্দিরে আগুন দেয়ার খবর পেয়ে নবাবপুরের বেশির ভাগ দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। হিন্দুর দোকানের আশেপাশে মুসলমানদের দোকানের সামনে লোকজন লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে। একথা সবাই জানে আগুন হিন্দু মুসলামান চেনে না। হিন্দুর দোকানে আগুন লাগলে সে আগুন পাশের দোকানেও ছড়াবে।। আগে থেকে সবাই নিজের গরজেই সাবধান হয়ে গেছে, যাতে কোনো দোকানে কেউ আগুন দিতে না পারে।

পিন্টুদের স্কুলের গেট ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। বাইরে থেকে কয়েকবার লোহার গেট–এ শব্দ করলো পিন্টু। গেট এর গোল ছিদ্র দিয়ে বুড়ো দপ্তরি কৃষ্ণপদর ভয়ার্ত চোখ দেখা গেলো। পিন্টু আর রতনকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে ছোট গেটটা খুলে দিলো কৃষ্ণপদ। রতনকে দেখে বললো, 'তোমরা ভালো আছো রতন?'

রতন মাথা নেড়ে সায় জানালো। পিন্টু জিজ্ঞেস করলো, 'স্যারদের খবর কিছু জানেন?'

কৃষ্ণপদ বললো, 'ব্রাদার টমাস গিয়া ঘোষাল স্যার, নন্দী স্যার আর ভৌমিক স্যাররে ইস্কুলে নিয়া আসছে।'

'স্যাররা কোথায়?'

'ক্লাস ওয়ানের কামরা খালি কইরা ওনাগো থাকনের ব্যবস্থা করছি।'

স্কুলের ভেতরে একেবারে পুব কোণে ক্লাস ইনফ্যান্ট আর ওয়ানের ক্লাস বসে একতলা এক বাড়িতে। পাশা-পাশি দুটো ঘর, সামনে বড় বারান্দা। পিন্টুরা গিয়ে দেখলো বারান্দায় পাতা দুটো বেঞ্চে বসে আছেন স্যাররা। সবার পরনে পায়জামা, গায়ে চাদর, মুখে দু' দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। স্কুলের এই তিন স্যার একা থাকেন। একজন বিয়ে করেননি। অন্য দুজনের স্ত্রী মারা গেছেন অনেক আগে। ছেলে মেয়েরা থাকে বাইরে বাইরে। স্কুলের কমবয়সী স্যাররা সবাই প্যান্ট শার্ট পরেন। বুড়ো হিন্দু স্যাররা সব সময় ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। আজ সবার পরনে পায়জামা দেখে রতনের বুকটা ধক করে উঠলো। ওর মনে হলো বাবা যদি আজ বাইরে যেতে চান তাহলে তাঁকেও পায়জামা পরতে হবে। বড়দা, মেজদা অবশ্য সব সময় ঘরে পায়জামা পরে। কিন্তু বাবা ধুতি বাদ দিয়ে পায়জামা পরছেন এটা রতন মেনে নিতে পারলো না।

ভৌমিক স্যার ওদের দেখে শুকনো হেসে বললেন, 'কিরে তোরা কোত্থেকে এলি?'

পিন্টু বললো, 'আপনাদের খোঁজ খবর নিতে এলাম স্যার।'

'এখনও বেঁচে আছি।' ভৌমিক স্যারের মুখের হাসিটা কান্নার তো মনে হলো।

নন্দী স্যার বললেন, 'তোদের ওদিকে গণ্ডগোল হয়নি রতন?'

রতন বললো, 'এখনও হয়নি। কাল একদল আসতে চেয়েছিলো। লাঠি নিয়ে সবাই মিলে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। রাতে দল বেঁধে পাড়ায় পাহারা দিচ্ছি।'

ঘোষাল স্যার বললেন, 'আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে মুসলিম লীগের এক লোক। রোজ দেখা হলেই বলে কী মাষ্টার, ইণ্ডিয়া কবে যাইবেন? যাইবার আগে বাড়িটা আমারে দিয়া যাইয়েন। নাকি আর কার কাছে বেইচ্যা ফালাইছেন! আপনে গো তো বিশ্বাস নেই।'

ভৌমিক স্যার বললেন, 'নলিনী স্যারের জন্য চিন্তা হচ্ছে। ওদের পাড়ায় আর কোনো হিন্দু বাড়ি নেই।'

পিন্টু বললো, 'আমার সঙ্গে কাল নলিনী স্যারের দেখা হয়েছিলো। ওঁদের বাজার করে দিয়েছি।'

'ভালো করেছিস বাবা!' কৃতজ্ঞতা ভরা গলায় বললেন ভৌমিক স্যার—'ওঁর জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিলো।'

নন্দী স্যার জিজ্ঞেস করলেন, 'শহরের অবস্থা কিছু জানিস? খবরের কাগজে দেখলাম কাল নাকি ঢাকেশ্বরী মন্দির আর সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে হামলা করেছিলো?'

রতন বললো, 'আজও অবস্থা ভালো নয়। আমরা ঠাটারি বাজারের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে শুনলাম ওখানকার মন্দিরে নাকি আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভৌমিক স্যার বললেন, 'আমি এটাই বুঝি না, এখানে মন্দির পোড়ালে কি আর অযোধ্যার ভাঙা বাবরী মসজিদ জোড়া লাড়বে, না যারা ভেঙেছে তাদের কোনো ক্ষতি হবে! মানুষ একেবারে পাগল হয়ে গেছে।'

পিন্টু বললো, 'মানুষ কাদের বলছেন স্যার, যারা মন্দির মসজিদ ভাঙে তারা মানুষ না জানোয়ার।'

নন্দী স্যার তিক্ত গলায় বললেন, 'তুই ঠিক বলেছিস। এরা কেউ মানুষ নয়।'

ঘোষাল স্যার বললেন, 'তোরা আর বাইরে থাকিস না। কোথায় কখন গণ্ডগোল লাগে—বাড়ি যা।'

স্কুল থেকে বেরিয়ে পিন্টু আর রতন একটা রিকশা নিলো। ওদের দু'জনের বুকের ভেতর ঝড় বইছে। দু'দিনের ঘটনা ওদের বয়স দশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। এ সময় ওদের তো এভাবে একটার পর একটা তিক্ত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাওয়ার কথা ছিলো না! পিন্টু আর রতন ভোলা যাবে বেড়াতে, যে জন্য পিন্টু ফকিরাপুল আর সূত্রাপুরের ফুটবল ম্যাচ পর্যন্ত খেললো না। কথা ছিলো বড় দিনের ছুটিতে বেড়াবার, খেলার, মনের আনন্দে যা ইচ্ছে করে তাই করার, অথচ এখন ওদের দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য রাত জাগতে হচ্ছে, যারা বিপদে পড়েছে তাদের খোঁজ খবর নিতে হচ্ছে, সারাক্ষণ কাটাতে হচ্ছে প্রচণ্ড এক উদ্বেগের ভেতর—কখন কী ঘটে, নতুন করে আবার কোন বিপদ দেখা দেয়—শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ ঠেকানো যাবে তো!

বিকেলে রতনদের বাড়িতে দুটো রিকশা এসে থামলো। রতনের দূর সম্পর্কের এক মামা থাকেন ডেমরার কাছে শনির আখড়ায়। তিনি সপরিবারে চলে এসেছেন।

মামী কালো বোরখা পরে এসেছিলেন। কপালের সিঁদূর মুছে ফেলেছেন। ঘরের ভেতর ঢুকে বোরখা খুলে তার পাঁচ সাত বছরের দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে রতনের মাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন—'দিদি গো, আমাগো সব শ্যাষ ওইয়া গেছে। বাড়ি ঘর, জিনিসপত্র যা আছিল—কুত্তার বাচ্চারা সব আগুন দিয়া ছাই কাইরা ফালাইছে।'

রতনের মামা জানলেন, পরশু বিকেলে এক দফা হামলা হয়েছে, বাকিটুকু হয়েছে গতকাল। শনির মন্দির ভেঙে গুণ্ডারা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। আখড়ার চারপাশে একান্নটি পরিবার ছিলো। প্রত্যেকটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কাল রাতে শীতের ভেতর সবাই গাছতলায় ছিলো। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর কান্নায় সারা রাত চারপাশের মানুষজন ঘুমোতে পারেনি। কাল দুপুরের পর থেকে কারও পেটে কিছু পড়েনি। মামার পাঁচ বছরের ছেলেটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে।

দুপুরে রতন পিন্টুদের বাড়িতে খেয়েছে। স্বপন সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও আসেনি। ওদের জন্য রাখা ভাত আর তরকারি যা ছিলো রতনের মা বের করে দিলেন তাঁর ভাইয়ের পরিবারকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটো কী গোগ্রাসে ভাত গিললো দেখে ওঁর কান্না পেলো। রতনের মামা মামীও খেতে বসেছিলেন। বার বার চোখের জলে ওদের পাতের ভাত একাকার হয়ে যাচ্ছিলো। ওঁরা দুজন কিছুই খেতে পারলেন না।

রতনের মামা ডেমরা ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে চাকরি করেন। চার তারিখে বেতন পেয়ে নিজের হাত খরচের টাকাটা সঙ্গে রেখে পুরোটা রতনের মামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। লোহার ট্রাঙ্কে রাখা ছিলো। সেই টাকা, সঙ্গে তাঁদের বিয়ের সময়কার আট ন' ভরি সোনার গয়না যত্ন করে মামী তুলে রেখেছিলেন ছেলেমেয়েদের বিয়েতে দেয়ার জন্য। তাঁর চোখের সামনে সেই ট্রাঙ্কটা মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো অচেনা এক ছেলে। সঙ্গে লাঠি হাতে আরও দু'জন ছিলো। একজন নিয়েছে তাঁর টু ইন ওয়ান আরেকজন নিয়েছে তাঁর সখের সেলাই মেশিনটা। কাঠের আলমারি ভেঙে শাড়ি কাপড় যা পেয়েছে একজন সেগুলো নিয়ে গেছে বিছানার চাদরে পোটলা বেঁধে। ছেলেমেয়ে দুটোকে বুকে চেপে ধরে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এসব কিছুই তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। বাধা দেবেন কি—ওরা যে তাঁদের প্রানে মারেনি এই তো বেশি! লুটপাট শেষ করে তাদের টিনের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। মামীর চোখের সামনে তাঁর বারো বছরের সাজানো সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

রতন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সব শুনলো। মামীর ছোট ছেলে মেয়ে দুটোকে দেখলো থালা চেটে ভাত খেতে। মনে হলো ওদের ক্ষিদে বুঝি এখনও মেটেনি।

ঠাকুরমা ছেলে মেয়ে দুটোকে কলতলায় নিয়ে হাত মুখ ধুইয়ে দিলেন। মামা অসহায় গলায় রতনের বাবাকে প্রশ্ন করলেন—'দাদা, অখন আমগো কী ওইবো? আমরা কই যামু?'

রতনের বাবা শুকনো গলায় বললেন, 'সবাইর যা অয় তোমাগোও তাই ওইবো। যাইবা কই, এইহানে থাক।'

'ঠাকুরমা বললেন, 'হ, সবাই একলগে থাকলে মনে জোর পাওন যায়।'

এমন সময় পিন্টু এসে দরজার বাইরে থেকে গলা তুলে রতনকে ডাকলো দরজা খুলে রতন বেরিয়ে এলো। পিন্টু বললো, 'মিটিঙে যাবি না? মেজদা কই?'

রতন ওর বাবাকে দরজা বন্ধ করতে বলে পিন্টুর সঙ্গে বেরুলো। বললো, 'মেজদা সকালে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি।'

পিন্টুদের ছাদের মিটিঙে রতন ওর মামা মামীর অভিজ্ঞতার কথা বললো। রাগে সবার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো। রতন বললো, 'শনির আখড়ার বেশির ভাগ মানুষের যাবার কোনো জায়গা নেই। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে সবাই গাছতলায় বসে আছে। কাল সারারাত শীতে কষ্ট পেয়েছে ছোট বাচ্চারা।'

ইরফান সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলো। বললো, 'আমরা কালই শনির আখড়ায় যাবো রিলিফ নিয়ে। রাতের ডিউটি আগের মতো চলবে। প্রত্যেকে এখন রিলিফ তোলায় জন্য বেরিয়ে পড়ো। বাচ্চাদের জামা কাপড়, কম্বল, চাদর, নগদ টাকা যা পাওয়া যায়। টাকা দিয়ে বাচ্চাদের জন্য দুধ আর বড়দের জন্য চিড়া কিনবো। তোমরা তো জানো গতবার সাইক্লোনের রিলিফ আমরা কিভাবে তুলেছিলাম।'

পনেরো মিনিটের ভেতর মিটিঙ শেষ করে দিলো ইরফান। ঠিক হলো ডালপট্টি থেকে শুরু করে সূত্রাপুরের বাজার পর্যন্ত প্রত্যেকটা বাড়ি আর দোকানে যেতে হেবে। একানব্বই'র ঘূর্ণিঝড়ের সময় ইরফানরা এভাবেই রিলিফ তুলেছিলো। বড়রা যাবে দোকানে, ছোটরা আর মেয়েরা যাবে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে।

মেয়েদের দল বানালো হাসি। ওর দলে তপতী, কেতকী আর রূপচাঁদ লেনের ইডেনে পড়া দুটো মেয়ে ছিলালো। পিন্টুদের দলে ছিলো সাতজন। বিকেল সাড়ে চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ঘুরলো ওরা। যতটা পাবে ভেবেছিলো ততটা অবশ্য পাওয়া গেলো না। কয়েক জায়গায় শনির আখড়ার জন্য রিলিফ চাইতে গিয়ে পিন্টুরা উল্টো ধমক খেয়েছে। বলা বাহুল্য সেগুলো ছিলো হিন্দু বিদ্বেষীদের বাড়ি। চৌধুরী ভিলার নগেন্দ্র চৌধুরীও ওদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'রিলিফ যা দেয়ার আমি নিজে দেবো।'

রিলিফের জন্য পিন্টুরা রতনদের বাড়িতেও গিয়েছিলো। রতনের মামা যেই শুনলেন শনির আখড়ার দুঃস্থ পরিবারদের সাহায্য করার জন্য ওরা কাল যাচ্ছে, তখন পিন্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। গভীর আবেগে বললেন, 'তোমরা আছো

বলেই ঈশ্বরের পৃথিবীতে এখনও চন্দ্র সূর্য ওঠে।'

রতনদের বাড়িতে ছোটদের কাপড় ছিলো না। ওর মা আর ঠাকুরমা নিজেদের পরনের দুটো শাড়ি আর একখানা মোটা বিছানার চাদর দিয়েছেন। পিন্টুদের সবাই জামা, কাপড়, বিছানার চাদর, কম্বল এসব দিয়েছে। কেউ ওদের নগদ টকা দেয়নি।

হাসিরা পুরোনো কাপড়ের সঙ্গে নগদ আড়াইশ টাকার মতো পেয়েছে। ইরফানরা তুলেছে তিন হাজার টাকার মতো। অন্যরা সবাই টাকা তুলেছে, নিজেরা টাকা তুলতে পারেনি দেখে পিন্টু ওর সঞ্চয় থেকে দুশ টাকা দিয়েছে। আরও দিতে চেয়েছিলো, রতন বাধা দিয়েছে। বলেছে পরেও তো কাউকে সাহায্য করতে হতে পারে।

পরদিন সকালে ইরফান দেড় টনের একটা ছোট ট্রাক জোগাড় করে আনলো। নগদ টাকা দিয়ে বাচ্চাদের দুধ, চিড়া আর মাটির সানকি কেনা হয়েছে। খাবার পরিমাণে অবশ্য যথেষ্ট ছিলো না, পরিবার পিছু বেশি হলে একদিন চলবে।

সকাল এগারোটায় ট্রাক নিয়ে শনির আখড়ায় এলো ইরফান। পিন্টু আর রতনের মামাকেও সঙ্গে এনেছে। আখড়ার মন্দিরটা ছিলো পাকা ইমারত। দেখে মনে হয় বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা হয়েছে ওটা। আখড়ার ঘরবাড়ি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখানে সেখানে পোড়া টিন ছড়িয়ে রয়েছে। আগুনের আঁচে চারপাশের গাছগুলো পর্যন্ত ঝলসে গেছে।

রাস্তার মাথায় কয়েকজন পুলিশকে পাহারা দিতে দেখলো। রতনের মামা বললো, 'পরশু যখন মন্দির ভাঙা হচ্ছিলো আমরা পুলিশের ফাঁড়িতে খবর দিয়েছিলাম। কেউ আসেনি।'

আখড়ার প্রায় সব কটি পরিবার গাছের তলায় বসে আছে। ইরফানদের ট্রাক দেখে কেউ এগিয়ে এলো না। রতনের মামা ট্রাক থেকে নেমে গিয়ে লোকজনদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর একজন দু'জন করে আসতে লাগলো। সব মিলিয়ে সেখানে তখন গোটা চল্লিশেক পরিবার ছিলো। যাদের অবস্থা বেশি খারাপ ইরফান নিজের পকেট থেকে তাদের কাউকে বিশ কাউকে ত্রিশ টাকা দিলো। এর বেশি দেয়ার সামর্থ ছিলো না ওর। ক্ষতিগ্রস্ত সবগুলো পরিবারের কর্তা আর সদস্য সংখ্যা কয়জন তার তালিকা তৈরি করলো ইরফান। পরিবারের শিশুদের সংখ্যাও আলাদাভাবে উল্লেখ করলো। বললো, 'আজই আমি রেডক্রসকে আপনাদের কথা জানাবো। আশা করি দু' এক দিনের ভেতর ওরা সাহায্য নিয়ে আসবে।'

দশ

দশ তারিখ থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছিলো। তবে খবরের কাগজগুলোতে বিভিন্ন এলাকার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ গোটা সপ্তাহ জুড়েই ছাপা হয়েছে। বারো তারিখে ভোলা থেকে শেখরদার বড় ভাই রণেনদা সপরিবারে এসে

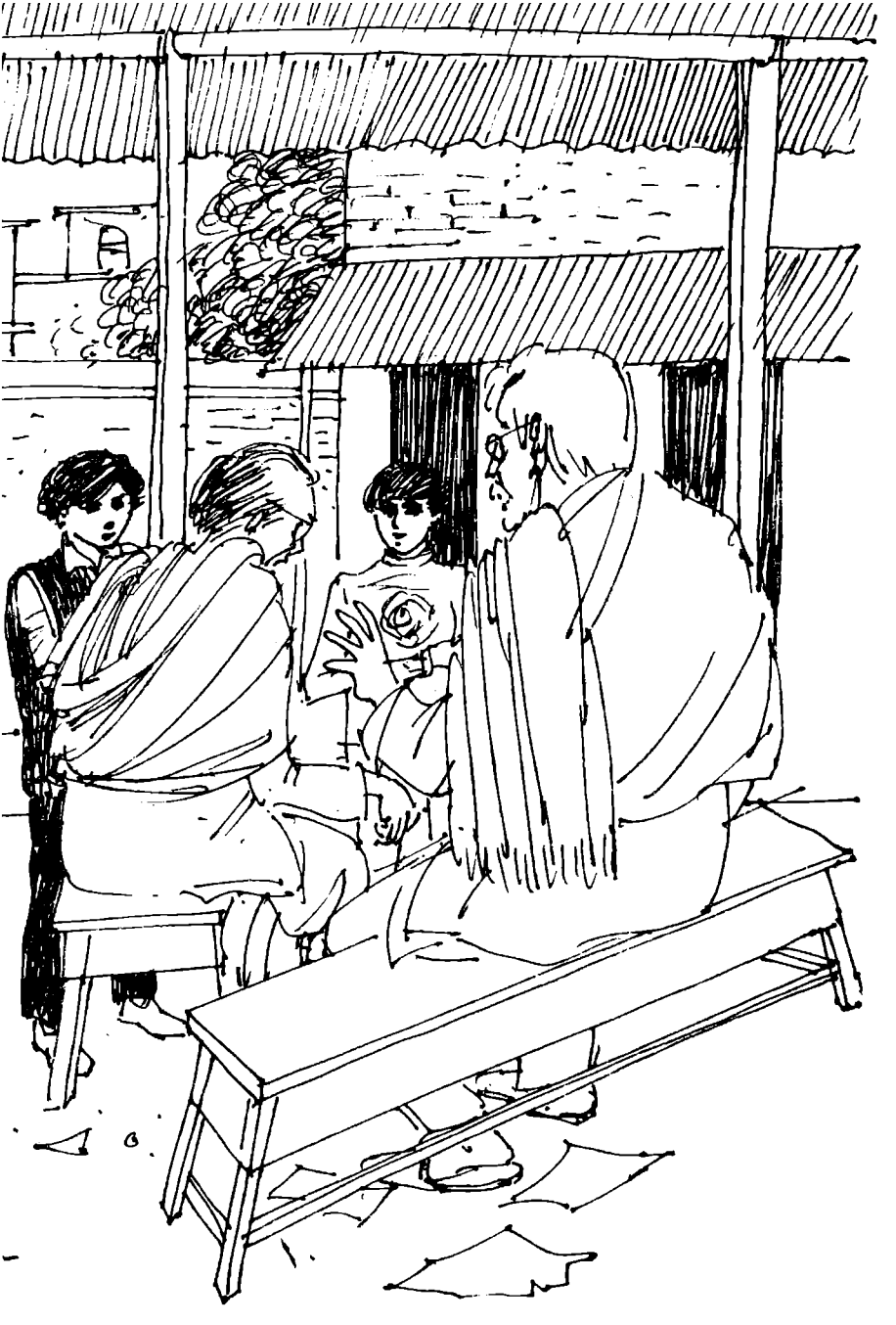

ঃ এখানে মন্দির পোড়ালে কি যারা বাবরী মসজিদ ভেঙেছে তাদের কোনো ক্ষতি হবে

রতনদের বাড়িতে উঠলেন। রতনের বড়দিরা সামনের মাসে আসবে বলেছে। শহরের অবস্থা নাকি এখন স্বাভাবিক হয়েছে। শহরের মন্দির ভাঙা ছাড়া তেমন কোন গণ্ডগোল হয়নি। রণেনদাদের বাড়ি কাঞ্জের হাট-এ। সেখানে তাদের ধান সুপারির মস্ত বড় কারবার ছিলো। রণেনদা বললেন, তাদের আড়তে ধান ছিলো তিন লাখ টাকার, সুপারি ছিলো সত্তর আশি হাজার টাকার। গোটা আড়ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তাঁদের বাড়িঘর ও আগুনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাঁর পাশের বাড়ির এক মেয়েকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। তিন দিন পর আধমরা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভোলা হাসপাতালে আছে এখনও, বাঁচে কিনা সন্দেহ।

রণেনদা, তাঁর স্ত্রী আর তিন ছেলেমেয়ে সবাই কলকাতা চলে যাবেন। তাঁদের গ্রামে গুণ্ডাদের ঢোকার খবর পেয়ে রণেনদা একটা সুটকেসে কিছু জামা কাপড় নিয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন পাশের গ্রামের এক স্কুলে। স্কুলের হেডমাস্টার তাঁর পরিচিত ছিলেন। আগের দিন হেডমাস্টার আবদুর রহিম এসে বলে গিয়েছিলেন অসুবিধে হলে তাঁদের ওখানে চলে যেতে।

সময় মতো পালাতে পেরেছিলেন বলে ঘরে নগদ টাকা আর গয়নাপত্র যা ছিলো বাঁচাতে পেরেছেন। ওঁদের সবার পাসপোর্ট আগেই গুছিয়ে রেখেছিলেন।

পরদিন তাঁরা ভিসার জন্য পাসপোর্ট জমা দিয়ে এলেন ভারতীয় হাই কমিশনে। স্বপন আগেই ঠিক করে ফেলেছে তপতী, কেতকী আর রতনকে নিয়ে কলকাতা চলে যাবে। রণেনদা বললেন, 'যাইবাই যদি--আমাগো লগে চলো।' সবাই মিলে আলোচনা করে সেরকমই সিদ্ধান্ত হলো। কেতকী আর রতনের পাসপোর্ট ছিলো না। দালালকে বেশি টাকা দিয়ে একদিনের ভেতর ওদের ইণ্ডিয়ার পাসপোর্ট করিয়ে নিলো স্বপন।

দু'দিন পর ওদের সবার ভিসাও হয়ে গেলো। কলকাতা যাবার কথা পিন্টুকে আগে বলেনি রতন। কিভাবে বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলো না। মেজদা বলেছে ভালো একটা চাকরি জোটাতে পারলে বাবা মাকেও নিয়ে যাবে। বড়দা অবশ্য বলেছে বাপ ঠাকুদার ভিটা ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। ঠাকুরমাও বলেছেন, 'আমার আর কয়দিন! যে কয়দিন বাইচ্যা আছি স্বামী শ্বশুরের ভিটায় সন্ধ্যা দিমু। তোমরা যার মনে লয় যাও গিয়া। আমি যতীনের কাছে থাকুম।' রতনের বাবা 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলেননি। সারাদিন ঘরের ভেতর গুম হয়ে বসে থাকেন। দু'দিন পিন্টুর বাবা ডাকতে এসেছিলেন। 'শরীর ভালো না' বলে ঘর থেকে বেরোননি।

উনিশ তারিখ কলকাতা যাবার দিন ঠিক হলো। এখন আর রাতে পাহারা দিতে হয় না। মাঝে মাঝে মোল্লাদের দু' একটা মিছিল রাস্তায় বের হলেও শহরের উত্তেজনা থিতিয়ে গেছে। ষোল তারিখ ছিলো বিজয় দিবস। সাংস্কৃতিক জোট এগারো তারিখ থেকে বিজয় মেলার বিরাট আয়োজন করেছিলো।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটি করেছে। দশ তারিখে সমন্বয় কমিটি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বড় বড় বেশ কয়েকটা মিছিল আর জনসভাও হয়েছে। বাবরী মসজিদ ভাঙা নিয়ে যারা বেশি বাড়াবাড়ি করছিলো এতে তারা অনেকখানি দমে গেছে।

বিজয় দিবসের দিন বিকেলে পিন্টুর সঙ্গে রতন বেরিয়েছিলো অনুষ্ঠান দেখতে। পাবলিক লাইব্রেরির সামনে বিশাল মঞ্চ বানানো হয়েছে। গত চারদিন ধরে ওখানেই হচ্ছিলো মূল অনুষ্ঠান, যার বেশির ভাগই ছিলো হিন্দু মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে।

রাতে রিকশায় করে বাড়ির ফেরার সময় রতন বললো, 'রণেনদারা উনিশ তারিখে কলকাতা যাচ্ছেন।'

পিন্টু চুপ করে রইলো। রতন আবার বললো, 'মেজদা, সেজদি আর ছোড়দি ওদের সঙ্গে যাচ্ছে।'

পিন্টু কোন কথা বললো না।

রতন আস্তে আস্তে বললো, 'ওদের সঙ্গে আমিও যাচ্ছি।'

পিন্টু চমকে উঠলো—'কী বললি?'

'আমিও কলকাতা যাচ্ছি।'

'কেন?'

'এখানে থেকে কী করবো?'

'কী করবো মানে?'

'এখানে আমাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।' স্বপনের যুক্তি দিয়ে পিন্টুকে বোঝাতে চাইলো রতন।

'তার মানে তুই একেবারে চলে যাচ্ছিস?'

'হ্যাঁ।'

পিন্টু চুপ করে রইলো। রতনের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিলো ওর। অভিমানে বার বার গলা বুজে আসতে চাইছে। এ কী বলছে রতন। দু'দিন পর ওকে ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যাবে? গত দশ বছর ধরে যার সঙ্গে ওঠা বসা, চলাফেরা, সকল সুখদুঃখের একমাত্র অংশীদার—পিন্টু কী নিয়ে থাকবে? নিজের কোনো ভাই থাকলেও বুঝি তাকে এতোখানি ভালোবাসতো না, যতখানি ও রতনকে ভালোবাসে। রতন কি সব ভুলে গেছে?

পিন্টু চুপ করে থাকলেও ওর মনের অবস্থা রতন ঠিকই বুঝতে পারছিলো। অনেকক্ষণ পর বললো, 'তোকে ছেড়ে যেতে কি আমার কম কষ্ট হচ্ছে পিন্টু? গত দু'রাত এক ফোঁটা ঘুমোতে পারিনি। সারাক্ষণ তোর কথা ভেবেছি। জানি তুই কতখানি কষ্ট পাচ্ছিস। তবু আমাদের অবস্থাটা একবার বোঝার চেষ্টা কর। আমার জায়গায় যদি তুই হতি তাহলে কী করতি?'

পিন্টু থমথমে গলায় বললো, 'তোর জায়গায় আমি হলে রুখে দাঁড়াতাম। তোর মতো পালিয়ে যেতাম না।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রতন বললো, 'তোর মতো সাহস আমার নেই।'

'ঠিক আছে যা!' তিক্ত গলায় পিন্টু বললো, 'কলকাতায় নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক ভালো বন্ধু পাবি।'

'তোর মতো বন্ধু পৃথিবীর কোথাও পাবো না।'

'বাজে কথা বলবি না রতন।'

'সত্যি বলছি পিন্টু। তোকে কোনোদিন ভুলতে পারবো না।'

'এসব কথা তোর কলকাতার বন্ধুদের বলিস।'

রতন চুপ করে রইলো। পিন্টুর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে গিয়ে ওর বুকের ভেতর জমে থাকা কান্না গুমরে মরছিলো। পিন্টু ওর অবস্থা বুঝতে পারবে না। পিন্টুর পক্ষে সাহস দেখানো যত সহজ রতনের পক্ষে ততই কঠিন।

বাকি রাস্তা একটা কথাও বললো না পিন্টু। কাগজিটোলা গলির মুখে রিকশা থামিয়ে ও ভাড়া দিলো। রতন একটু ইতস্তত করে মৃদু গলায় বললো, 'আজ রাতে কি তোর সঙ্গে থাকবো পিন্টু?'

'ফালতু দরদ দেখাবার কোনো দরকার নেই।' বলে পিন্টু ওদের বাসায় ঢুকে গেলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতন বাড়ির পথে পা বাড়ালো।

রণেনদারা যাবে বাই রোড। বাসে করে যশোর, সেখান থেকে বেনাপোল। বর্ডার পার হয়ে বনগাঁয়ে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবে। সকালে রওনা হলে রাত আট নটা নাগাদ কলকাতা পৌঁছবে। যাবার আয়োজন নিয়ে খুব সবাই ব্যস্ত। রণেনদার সঙ্গে হাজার পঞ্চাশেক টাকা ছিলো। গয়নাপত্রও কম ছিলো না। এত টাকা গয়না সঙ্গে নেয়া যাবে না বলে হুন্ডির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। হুণ্ডিওয়ালাদের ঢাকায় বাংলাদেশের টাকা দিলে কলকাতায় ওদের লোক সেই পরিমাণ ভারতীয় টাকা দেবে। অবশ্য ওদের কমিশন কেটে রাখা হবে।

রতনের মা ওদের জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছিলেন, আর সুযোগ পেলেই চোখের জল ফেলছিলেন। ঠাকুরমা অবশ্য কয়েকবার বলেছেন, 'কান্দ ক্যান বউ? যাত্রার সময় এই রকম কানলে পোলা মাইয়ার অকল্যাণ ওইবো।' ওতে মার কান্না থামেনি।

পরদিন সকালে পিন্টু ওর মাকে—'সবাইরে যাচ্ছি, ফিরতে রাত হবে', বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। রতন ওকে খুঁজে পেলো না। পিন্টুর মা বলতে পারলেন না ও কোথায় গেছে।

দুপুরে একবার, রাত নটার দিকে আরেকবার পিন্টুর খবর নেয়ার জন্য রতন ওদের বাসায় গিয়েছিলো। ওর দেখা পায়নি। বুঝতে পারলো পিন্টুর সঙ্গে যাবার আগে আর দেখা হবে না।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিলো পিন্টু। ওর মা খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। হাসি বার বার বলছিলো, 'রাত হবে মানে কি দশটা বাজবে? আজ আসুক বাড়িতে। ওকে তুমি বেশি লাই দিচ্ছো মা!' পিন্টুর বাবা বুঝতে পেরেছেন ছেলে কেন বাড়ি থেকে দূরে সরে থাকছে। হাসিকে বললেন, 'পিন্টুকে কিছু বলিস না। বুঝতে পারছিস না রতনরা চলে যাচ্ছে বলে ওর খারাপ লাগছে!'

রাত করে ফেরার জন্য পিন্টুকে বাড়িতে কেউ কিছু বলেনি। পরদিন ভোরে আবার বেরিয়ে গেলো ও। রতন খুঁজতে এসে মন খারাপ করে ফিরে যাচ্ছিলো, পথে এরফানের সঙ্গে দেখা। ওর শুকনো চেহারা দেখে এরফান জানতে চাইলো, 'তোমার কী হয়েছে রতন? খুব ডিপ্রেসড মনে হচ্ছে! রাতে ঘুম হয়নি?'

রতন ধরা গলায় বললো, 'আমরা চলে যাচ্ছি ইরফান ভাই।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো ইরফান।

'কলকাতা। মেজদা, সেজদি, ছোড়দি সবাই যাচ্ছে। একটু থেমে আবার বললো, 'পিন্টু খুব রাগ করেছে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঘুরেছে। আজও ভোরে বেরিয়ে গেছে।' ইরফানের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রতন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। 'ও এরকম কেন ইরফান ভাই? আমাদের অবস্থা একটুও বুঝতে চাইবে না!'

ইরফান জানে রতন আর পিন্টুর গভীর বন্ধুত্বের কথা। রতনের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আমাদের বাসায় চল। তোমার সঙ্গে কথা বলবো।'

চোখ মুছে রতন ইরফানের সঙ্গে ওদের বাসায় এলো। বাড়িতে ওর বাবা মা আর একটা কাজের ছেলে থাকে। ড্রইংরুমে রতনকে বসিয়ে ইরফান কাজের ছেলেকে ডেকে দু' কাপ চা দিতে বললো। তারপর রতনকে সরাসরি প্রশ্ন করলো, 'সবাই যাচ্ছে যাক, তুমি কেন যেতে চাইছো?'

কলকাতা যাবার পক্ষে স্বপন অনেকগুলো যুক্তি দাঁড় করিয়েছে। যতীনের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলার সময় রতনও ছিলো। স্বপনের যুক্তিগুলো নিজের মতো করে ও ইরফানকে বললো। অপমানের কথা, জীবনের ঝুঁকির কথা, চাকরি বা ব্যবসার ক্ষেত্রে অসুবিধের কথাগুলো বড়রা যেভাবে বলে রতনও সেভাবে বললো।

চা খেতে খেতে ইরফান বললো, 'আমি সব বুঝি রতন। তারপরও তোমাকে বলবো, কলকাতা তোমার দেশ নয়। ওখানে গিয়ে দেখবে ওদের কথা বলার ধরন আলাদা, চলাফেরার ধরন আলাদা, চিন্তা ভাবনা—কোনো কিছুর সঙ্গেই তুমি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে না। এটা ঠিক যে ধর্মের কারণে কেউ সেখানে তোমাকে অপমান করবে না বা নিজেকে ছোট মনে হবে না। কিন্তু জীবনের অনিরাপত্তা সব জায়গায় আছে। কলকাতায় শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি। ওখানেও চাকরি বাকরি ব্যবসার ক্ষেত্রে তোমাকে বাঙাল বলে হেনস্তা করবে, কোনঠাসা করতে চাইবে। এখানে হিন্দু বলে নিজেকে মাইনরিটি মনে হচ্ছে তোমার। আমি নিজে কোনো ধর্ম মানি না। এ দেশে আমিও মাইনরিটি।

মাইনরিটি হলেই কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে? নিজেকে হিন্দু না ভেবে বাঙালি ভাবো, যেভাবে আমরা ভাবতাম মুক্তিযুদ্ধের সময়। তখন বুকে অনেক সাহস পাবে। কারণ এদেশে শতকরা নিরানব্বই, দশমিক নয় জনই বাঙালি। যারা রাজাকার, বাংলাদেশকে যারা পাকিস্তান বানাতে চায়, যারা ধর্মের নামে বাঙালি জাতিকে ভাগ করতে চায়, পাঞ্জাবিদের গোলামি করতে যারা ভালোবাসে, তারা হাজারে একজনও নয়। আমরা বরং তাদেরই পাকিস্তান পাঠিয়ে দেবো। তাদের জন্য কেন আমরা নিজেদের দেশ ছাড়তে যাবো, যে দেশের স্বাধীনতার জন্য তিরিশ লক্ষ বাঙালি প্রাণ দিয়েছে?'

ঃ সবাইকে একজোট হয়ে ওই পশুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে

রতন পাথরের মতো চুপ হয়ে ইরফানের কথা শুনছিলো। এ ধরনের কথার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ওর নেই। একটু থেমে ইরফান আবার বললো, 'তুমি পিন্টুর কথাও কি ভাববে না রতন? কলকাতার নির্বান্ধব পরিবেশে থাকতে পারবে তুমি পিন্টুকে ছেড়ে? আমরা সবাই যদি এসব দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে এক জোট হই তাহলে কি ওরা পারবে আমাদের সঙ্গে? দেখোনি সেদিন কিভাবে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি? আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে ওই পশুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। দেখবে ওরা পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।'

ইরফানের বাড়িতে ঘন্টা খানেক ছিলো রতন। শেষের দিকে ও একতরফা শুনে গেছে শুধু। কোনো কথা বলতে পারেনি। বাড়িতে এসে দেখলো কলকাতা যাওয়ার আয়োজন প্রায় শেষ। কাল সকালে যশোর যাওয়ার কোচের নটা টিকেট এনেছেন রণেনদা। ওকে দেখে ঠাকুরমা বললেন, 'পিন্টু গো বাড়িত থনে বিদায় লইয়া আইছস? স্বপন কেতু, তপু গিয়া তর কাকা কাকীরে প্রণাম কইরা আইছে।'

রতন কোনো কথা না বলে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ইরফানের কথাগুলো ওর বুকের ভেতর প্রচণ্ড ঝড় তুলেছে। সেই ঝড়ের কথা বাড়ির কাউকে ও টের পেতে দিলো না।

পরদিন ওদের কোচ ছাড়ার কথা সকাল নটায়। রণেনদা বলেছেন আটটার সময় বাড়ি থেকে বেরোলেই চলবে। রতন ঘুম থেকে উঠলো ছ'টার দিকে। পাড়ার মসজিদে সবে মাত্র ফজরের আজান দিয়েছে। আকাশে তখনও ভালো করে আলো ফোটেনি। সাদা কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে সব কিছু।

ওর মা ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে ঢুকেছেন। রতন একটা চাদর মুড়ি দিয়ে মাকে বললো, 'আমি অক্ষণই আইতাছি।'

আজ ও পিন্টুকে পালাতে দেবে না। বাইরের দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দিয়ে সাদা কুয়াশার সমুদ্রে নামলো রতন। চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু পিন্টুদের বাড়ি যেতে ওর কোনো অসুবিধে হলো না। পিন্টু থাকে বাইরের ঘরটায়। রতন ওর দরজায় টোকা দিতে যাবে এমন সময় খুট করে শব্দ হলো। কে যেন দরজা খুলছে।

পিন্টু বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বেরোতে যাবে, দরজা খুলে দেখে সামনে রতন দাঁড়িয়ে। অবাক হয়ে ও তাকালো রতনের মুখের দিকে।

রতনের ঠোঁটের ফাঁকে ভোরের ঘুম ভাঙা সূর্যের মতো এক ঝলক হাসি ফুটে উঠলো। পিন্টুর চোখে চোখ রেখে ও বললো, '[illegible] আমি পৃথিবীর কোথাও যাবো না।'

পিন্টুর বুকের ভেতর হাজারটা হলুদ পাখি গান গেয়ে উঠলো। রতনের নির্মল হাসি ততক্ষণে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। পিন্টু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলো কিভাবে শুরু হয় এক আলো ঝলমল উজ্জ্বল দিন।